উর্বশী

উর্বশী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়





কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৬৩
প্রকাশিকা
আভারাণী মিত্র
৪৬/৭, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
রঘুনাথ গোস্বামী

মুদ্রাকর
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
সন্তোষকুমার ধর
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দাম দু' টাকা

সমরেশ বসু

প্রীতিভাজনেষু

কলঙ্ক

আমার একটি আত্মীয়া সবে জননী হয়েছেন। তাঁর জন্যে এক বোতল পোর্টের দরকার ছিল। তাঁর স্বামী আমার হাতে ষোলটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, আমি তো কোথাও পাচ্ছি না। আপনার অনেক জানাশোনা আছে শুনতে পাই—দিন্ না যোগাড় করে।

যোগাড় করতে গিয়েই ভদ্রলোকের চালাকিটা ধরা পড়ল। যুদ্ধের তখন শেষ-মুখ—মৌর্য সাম্রাজ্যের স্বর্ণ যুগ নয়—চৌর্য সাম্রাজ্যের কালো যুগ চলছে। পোর্টের খবর দু'-এক জায়গায় না পাওয়া গেল তা নয়, কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশের নিচে তারা কথা কয় না।

আত্মীয়াটির সঙ্গে সম্পর্কটা এমনি যে ওই ষোলটা টাকা নিতেও বাধে। আরো ত্রিশটা টাকা চাইতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার ওপর দিনকাল এমনি যে হয়তো সন্দেহ করে বসবে আমি ব্ল্যাক-মার্কেটিং করছি। অথচ প্রাইভেট কলেজের দীনতম লেক্‌চারার আমি—ডি-এ জড়িয়ে দেড়শো টাকা মাইনে পাই। উদারতা দেখিয়ে নিজের টাকায় যদি পোর্টের বোতল একটা কিনেই ফেলি, তা হলে মাসের শেষ সাতদিন নির্ঘাত উপোস দিতে হবে।

অগত্যা কলেজী বন্ধু আদিত্য ডাক্তারের চেম্বারেই যেতে হল। আদিত্য ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ্—ওর কাছে হয়তো একটা হদিস মিলতেও পারে।

যাওয়ার আগে তিনবার আমি দ্বিধা করলাম। দু'বছর আগে ওর মুখদর্শন বন্ধ করে দিয়েছি। এককালে বন্ধুত্বটা ঘনিষ্ঠই ছিল, কিন্তু ওর স্ত্রী আত্মহত্যা করবার পর থেকে ওর নাম শুনলেই আমার

ঘৃণা হয়। ওর স্ত্রী যখন গলায় শাড়ির ফাঁস পরিয়ে বীভৎসভাবে নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটায়, তখন আদিত্য একটা তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে ওয়াল্‌টেয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার মাস্টারি-বিবেক এত বড় অপরাধটাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। যেতেই হল শেষ পর্যন্ত।

সারাটা দিনই অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘে অন্ধকার আকাশ। সন্ধ্যাটা বৃষ্টি আর এলোমেলো হাওয়ায় আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল, বসা রোডের এই ফাঁকা অঞ্চলটা আরো বেশী নির্জন হয়ে গিয়েছিল। ছাতাটা বন্ধ করে ওর চেম্বারে উঠতেই আমি থমকে গেলাম।

চেম্বারে মাত্র দু'জন বসে মুখোমুখি গল্প কবছিল। একজন আদিত্য, আর একজন সেই মেয়েটা। সেই দীপা মজুমদার—যাকে নিয়ে—

ইচ্ছে করল, তখনি নেমে যাই। কিন্তু সময় পাওযা গেল না। আদিত্য ডাকল, একি সুকুমার যে! আরে, এসো—এসো—

একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িযে আছি—দীপা মজুমদারই উঠে পড়ল। নিজের বেঁটে ছাতাটা তুলে নিযে বললে, আজ আসি আদিত্য দা।

আদিত্য বললে, এসো।

দীপা বাইরের বৃষ্টি-ভেজা পথে বেবিযে গেল। আমি ওকে কতটা ঘৃণা করি সেটা জানে বলেই বোধ হয় আমাকে কোনো সম্ভাষণ করতেও সাহস পেল না। আমিও স্বস্তি বোধ করলাম।

আদিত্য হাসল: অমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন সুকুমার? এসো—বোসো—

ভাবলাম, আজ কয়েকটা স্পষ্ট কথাই বলব ওকে। মেয়েটাকে দেখে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গিয়েছিল আমার। কী অদ্ভুত নির্লজ্জ আদিত্য! এত কাণ্ড—এত কেলেঙ্কারীর পরেও ও যে কী করে ওই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে সে আমি কল্পনাও করতে পারলাম না।

বিচারকের মতো কঠিন মুখ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম আমি।

—অনেক দিন পরে এলে সুকুমার। ভালো আছো তো ?—আদিত্য আমার দিকে সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে দিলে।

সিগারেট আমি স্পর্শও করলাম না। আকাশের মেঘের মতোই মুখের ওপর নিবিড় খানিকটা অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে বললাম, হুঁ, ভালোই আছি।

—চা খাবে ?

—না।

আদিত্য সিগারেট ঠুকতে লাগল টেবিলের ওপর। শান্ত গলায় বললে, অত চটেছ কেন ? দীপাকে দেখে ?

আমার এবার ধৈর্যচ্যুতি হল।

—তোমার লজ্জা করে না আদিত্য ?

আদিত্যের মুখে এক টুকরো ম্লান হাসি রেখায়িত হলঃ করে। দীপাকে দেখলেই লজ্জায় মরে যাই আমি! আমাকে একটা অসহ্য গ্লানি থেকে বাঁচাতে গিয়ে ও-যে কতবড় দাম দিয়েছে, সে-কথাটা ভেবে আজও আমি সান্ত্বনা পাই না সুকুমার।

—আদিত্য!—খুব সম্ভব একটা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের চমক লাগল আমার গলায়।

বাইরে ঘন হয়ে বৃষ্টি নেমেছে। আচ্ছন্ন বৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাল ডাক্তার। আস্তে আস্তে বললে, এমনি বর্ষার দিনেই রবীন্দ্রনাথ তার গোপন কথাটি বলতে চেয়েছিলেন। ওটা নিছক রোমান্স নয় সুকুমার। সত্যিই এক-একটা সময় আসে যখন যে-কথা-গুলো কাউকে বলা যায় না—সেই কথাগুলোই উজাড় করে বলতে ইচ্ছে করে। তোমরা শুধু একটা দিকই দেখেছ, আমাকে কোনো প্রশ্নই সেদিন করোনি। হয়তো প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষেও সম্ভব হত না। আজ মনে হচ্ছে এ ভার একা আর আমি বইতে পারছি না। কাউকে এর অংশ দিতে ইচ্ছে

করছে। তোমার সময় আছে সুকুমার—বসতে পারো একটু ?

তারপর আদিত্য ডাক্তার তার গল্প বলে গিয়েছিল।

আজ সাত বছর সে-গল্প আমি কাউকে বলিনি। এমন কি, এই সাত বছর ধরে নিজেকেই বার বার প্রশ্ন করেছি, এসব কি সত্যি ? আদিত্য কি বানিয়ে বলেনি গল্পটা ? নিউরোটিক স্ত্রীর ওপরে এইভাবেই একটা বীভৎস প্রতিশোধ নেয়নি সে ?

তবু সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করতে পারিনি। হয়তো আসবার মুখে স্বাভাবিক কস্ট্-প্রাইসেই এক বোতল পোর্ট আমি পেয়েছিলাম। সেই কৃতজ্ঞতাই হয়তো তার কারণ।

কিন্তু আজ যখন খবর পেলাম, বড় একটা বিলিতী ডিগ্রি নিতে গিয়ে ইয়োরোপে প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছে আদিত্য তখন এই কাহিনী প্রকাশ করবার একটা নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করছি। আর কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—কিন্তু দীপা মজুমদারের দুটি কৃতজ্ঞ চোখের দৃষ্টি আমি অনুমান করতে পারছি। আর সেইটুকুই আমার পুরস্কার।

ডাক্তার যা বলেছিল, তা এই।—

তোমরা আমার স্ত্রী বীথিকে জানতে। জানতে, সে সুন্দরী, বিদুষী, গুণবতী। কিন্তু এটা জানতে না—সে কী ভয়ঙ্কর নিউরোটিক।

দাম্পত্য-প্রেমের সে বীভৎস অভিশাপ বাইরে থেকে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সাজানো ড্রয়িং-রুমে স্বামী-স্ত্রী যখন হাসিমুখে ভালো চা আর ভালো খাবার দিয়ে বন্ধুদের আপ্যায়ন করছে, কেউ অনুরোধ জানালে স্ত্রী যখন অর্গ্যানে বসে মধুকণ্ঠে গান শোনাচ্ছে, তখন স্বভাবতই মনে হতে পারে—এমন আইডিয়াল কম্বিনেশন বুঝি কখনো হয় না! সে স্ত্রী যদি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে দু'কথা বলতে পারেন, নন্দলাল বসু আর যামিনী রায়ের আর্ট

সম্বন্ধে দু'-একটা মন্তব্য যদি জুড়ে দিতে জানেন—তাহলে তো আর প্রশ্নই থাকে না!

বন্ধুদের ঈর্ষ্যাদগ্ধ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শোনা যায়: সত্যি—তুমি কি সুখী!

কী সুখী! তাই বটে। রাত্রে শোবার ঘরের নিভৃত নাটকটাকে কেউ তো দেখতে পায় না। স্নায়বিক ব্যাধিতে জর্জরিত স্ত্রী যখন সশব্দে একটা ফুলদানি আছাড় দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করেন, সাপের মতো হিংস্র গর্জন করে বলেন, তুমি একটা ইতর, একটা জানোয়ার—আর স্বামীর যখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে নিজের মাথাটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে ইচ্ছে হয়—তখন সে বীভৎস অধ্যায়টা লোকের দৃষ্টির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে। কাউকে বলা যাবে না—কেউ বিশ্বাস করবে না! জুতোর পেরেক উঠে তীক্ষ্ণ দুঃসহ যন্ত্রণায় পায়ের তলা রক্তাক্ত হয়ে গেলেও যেমন মুখে হাসি টেনে পার্টিতে বসে গল্প করতে হয়—ঠিক তেমনিভাবেই এই মর্মান্তিক দাম্পত্য-লীলা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না আর।

তবু আমি সয়ে গিয়েছিলাম সুকুমার। একটা জিনিস বুঝেছিলাম, শান্তি আমি জীবনে কখনো পাবো না। প্রথম প্রথম কিসের একটা হিংস্র থাবা আমার হৃৎপিণ্ডকে আঁচড়ে চলত, মনে হত, এই আরণ্য জীবনবৃত্ত থেকে যেদিকে হোক ছুটে পালাই। কিন্তু অসহ্য রাত যেমন আছে, তার সঙ্গে তেমনি আছে অজস্র কাজে-ভরা দিন। আস্তে আস্তে দিনের কাজকে রাতেও টেনে আনলাম—ডুবে গেলাম মেডিকেল সায়ান্সের পাতায়। একটা পা কাটা গেলে কিছুদিন বাদে ক্রাচ্-লাঠি অভ্যস্ত হয়ে যায়—আমারও তাই হল।

এইভাবেই চলছিল। মানুষ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সিনিক না হয়ে ওঠা পর্যন্ত, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই মাথার অর্ধেক চুল পেকে না যাওয়া পর্যন্ত হয়তো চলতও এইভাবেই। তারপর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নামত একটা শ্রান্ত নির্বেদ। কিন্তু সে পর্যায়ে পৌঁছুবার আগেই পাশের ফ্ল্যাটে একঘর নতুন ভাড়াটে এল।

নবাগত এই প্রতিবেশীটির নাম নিশিবাবু। শুনেছিলাম, রাধা-বাজারের ওদিকে নাকি তাঁর কাগজের ব্যবসা আছে। ব্যবসা নিশ্চয় ফলাওভাবেই চলছিল। কারণ যুদ্ধের কল্যাণে কাগজ তখন উধাও—হয় মিলিটারী ব্লু-প্রিন্ট্ হয়ে মহাশূন্যে উড়ছে আর নয় তো পোস্টারে-প্রোপাগ্যাণ্ডায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চালাচ্ছে। সুতরাং নিশিবাবু সকাল সাড়ে সাতটায় বেরুতেন আর রাতে সাড়ে বারোটায় ফিরতেন। কখনো কখনো ফিরতেনই না।

তাতে তাঁর স্ত্রীর অসুবিধে ছিল না। তিনি আমাদের ফ্ল্যাটে বীথির সঙ্গে গল্প করতে আসতেন।

এই ভদ্রমহিলার একটু বর্ণনা দরকার।

এক ধরনের মেয়ে দেখেছ সুকুমার? কালো—বেশ কালো, অথচ দৃষ্টি পড়লে তুমি সহজে সে-দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারবে না। উজ্জ্বল তরল চোখ—অথচ সে চোখে কী একটা বিষাক্ত প্রভাব আছে। সুন্দর শরীরে একটা পল্লবিত ছন্দ—আচমকা তোমার মনে হবে পায়ের কাছে ফণা-তোলা একটা কেউটে সাপ দেখতে পাচ্ছ। মনে হচ্ছে তোমার এখুনি পালিয়ে যাওয়া দরকার, অথচ সেই তীক্ষ্ণ বিষাক্ত রূপের দিকে তাকিয়ে তুমি সরে যেতে পারছ না। রস-শাস্ত্রে নায়িকা-লক্ষণে সর্পিণীর উল্লেখ নেই কেন এ কথা একমাত্র পণ্ডিতেরাই বলতে পারবেন।

আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সামান্যই।

—ডক্টর রায়, এ আপনার ভারী অন্যায় কিন্তু।

অন্যায়? প্রায় প্রথম পরিচয়েই এ ধরনের অভিযোগের জন্যে আমি তৈরী ছিলাম না।

—কী করেছি?

—সারাদিন তো বাইরে বাইরে ঘোরেন আপনি। বেচারী বীথির কী করে দিন কাটে—বলুন তো?

মুখে এসেছিল, আপনার স্বামীই বুঝি আপনার আঁচলের তলায় আশ্রিত হয়ে বসে আছেন? মনে এসেছিল, রাত্রের কয়েক ঘণ্টাই

বীথি আমায় সহ্য করতে পারে না, আর চব্বিশ ঘণ্টা ওকে সঙ্গ দিতে গেলে ও হয়তো আমায় খুনই করে বসবে। কিন্তু মুখের কথা, মনের কথা—দুটোই আমি চেপে গেলাম। স্বাভাবিক সৌজন্যে জবাব দিলাম, ডাক্তার মানুষ—বুঝতেই পারেন অবস্থা। সময় কই আমার ?

—সময় করে নেওয়া উচিত। বীথির কত খারাপ লাগে—সেকি বোঝেন না ?

ধমক দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু আমি বিনয়ের হাসি হাসলাম। অযাচিত উপদেশটাকে ভদ্রভাবেই মেনে নিতে হল। ব্যাস—ওই পর্যন্তই। তারপর থেকে ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনোরকম বাক্যালাপ ঘটেনি। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে—হাসির বিনিময়ও ঘটেছে—ঠিক যতটুকু না হাসলে নয়। ভদ্রমহিলাকে আমার বিশেষ ভালো লাগেনি—উনিও যে আমাকে প্রীতির চোখে দেখছেন সে কথা মনে হয়নি কখনো। তাতে আমার কিছু আসে যায়নি। বীথির যদি ওঁকে ভালো লেগে থাকে—সেইটেই যথেষ্ট। বরং এইটেই ভেবেছি, আমার ওপর থেকে বীথির দৃষ্টিটা খানিক সরে গেলেই যেন স্বস্তি পাই আমি। ওর নিউরোসিসের জগতে আর একজন কেউ থাকুক। সঙ্গ দিক ওকে—ভুলিয়ে রাখুক।

আশ্চর্য, হলও তাই।

ভদ্রমহিলাকে বীথি ডাকত খুকুদি বলে। ওঁর আর কোনো নাম আছে কিনা জানতে চাইনি—জানবার কৌতূহলও আমার ছিল না। কিন্তু কৌতূহল বেড়ে উঠল তখন, যখন দেখলাম, বীথি একেবারে খুকুদি অন্ত প্রাণ হয়ে উঠেছে।

বীথি চরিত্রের দিক থেকে আত্মকেন্দ্রিক—রুচির দিক থেকে উন্নাসিক। খুকুদি'র সঙ্গে তার এই অন্তরঙ্গতা আমার কেমন ঝাড়া-বাড়ি ঠেকল। শিক্ষা-দীক্ষার বিচারে খুকুদি বীথির চাইতে অনেক নিম্নস্তরের, কথাবার্তায় স্পষ্ট একটা অমার্জিত ভঙ্গী। বীথি গ্রাজুয়েট, খুকুদি'র লেখাপড়া কতদূর জানি না, তবে ওঁর স্বহস্তের একটা ছোট

স্লিপ দেখেছিলাম একবার। তাতে তিন লাইনে চারটে বানান ভুল ছিল আর হাতের লেখা দেখে মনে হয়েছিল, ধোপার খাতার পরে উনি আর বেশীদুর এগোননি।

তবু দু'জনের মধ্যে কী যে বন্ধুত্ব জমে উঠল সুকুমার, সে তোমায় আমি ভালো করে বোঝাতে পারব না।

দুপুর হলেই খুকুদি একটা পানের বাটা নিয়ে ওপরে এসে বসেন। পান খাওয়া চলে, গল্প চলে। বীথি আগে কালে-ভদ্রে দু'-একটা পান খেত, খুকুদির পাল্লায় পড়ে দেখলাম ওর দস্তুরমতো নেশা হয়ে গেছে।

একদিন বলেছিলাম, ওঁর পান খাও কেন ? নিজে কিছু আনিয়ে নিলেই পারো ?

বীথি বলেছিল, না—না। খুকুদি'র মতো পান কেউ সাজতে পারে না। ওঁর হাতের একটা আলাদা স্বাদ আছে।

স্বাদ থাকে তো থাক। আমার কিছু বলবার নেই। বরং একদিক থেকে জিনিসটা ভালোই হয়েছিল আমার পক্ষে। যত দিন যেতে লাগল, আমার ওপর থেকে বীথির খরদৃষ্টিটা সরে যেতে লাগল একটু একটু করে। বীথির মেজাজের চেহারাও বদলাতে শুরু করল। অনেকটা শান্ত, অনেকখানি আত্মমগ্ন এখন। কখনো কখনো আমার সঙ্গে গল্প করতেও চেষ্টা করে। সবই খুকুদি'র গল্প। খুকুদি'র বাড়ির কোন আমড়া গাছে ভূত থাকত, ছেলেবেলায় খুকুদি কবে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন—এই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রায়ই শুনতে হত আমাকে। সেই চরিতামৃত শুনতে শুনতে ক্লান্তির ঘুম নেমে আসত আমার চোখে।

কখনো কখনো ভারী আশ্চর্য লাগত। সন্দেহ হত, বীথির চরিত্রে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। ও যেন খুকুদির প্রেমে পড়েছে—যেন খুকুদিকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আমার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধেগুলোর ওপর বীথির যে সতর্ক মনোযোগ থাকত, ক্রমশ সেটা যেন সরে যাচ্ছে দূরে।

প্রায়ই বীথি ও-পাশে ফ্লাটে গিয়ে বসে থাকত। আগে খুকুদি আসত, কিন্তু এখন যাওয়ার গরজটা যেন বীথির পক্ষ থেকেই। ডাকা-ডাকি করলেও সহজে আসতে চাইত না। রান্নার ব্যাপারে বীথি কোনোদিন চাকরকে বিশ্বাস করেনি—এখন ও-পাটটা সে ওদের হাতেই তুলে দিয়েছিল।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ব্যাপারে নিজের ওপরে নির্ভর করতে আমার ভালোই লাগে—ভোজন-বিলাসীও আমি নই। কাজেই এ সবে আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে চকিত হয়ে উঠতেই হল।

ডাক্তারীতে পশার তখনো এমন বেশি জমে ওঠেনি যে মুঠোমুঠো নোট পড়ে থাকে ট্রাউজারের পকেটে। বরং যা পেতাম, তার সম্পর্কে আমাকে সজাগ থাকতে হত। খরচ করতে হত সাবধানী হিসেবের সঙ্গে। এই অবস্থায় একদিন ড্রয়ার খুলে দেখলাম, চল্লিশটা টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।

বীথিকে ডাকলাম।

বীথির মুখে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল: অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন চল্লিশটা টাকার জন্যে? আছে আমার কাছে।

—তা হলে গোটা কুড়িক টাকা আমায় দাও। গরম জামা-কাপড়গুলো ধুতে দিয়েছিলাম, নিয়ে আসতে হবে আজ।

বীথি একটু চুপ করে থেকে বললে, তা হলে দিন কয়েক পরেই এনো।

—কেন? দিয়েছ নাকি কাউকে?

বীথি জবাব দিল না।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি অনুমান করে ফেললাম: তোমার প্রাণের বন্ধু খুকুদিকে দাওনি তো?

প্রশ্নটা নিরীহ—অন্তত উত্তেজিত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিউরোসিসের একটা বন্য আভা জ্বলে উঠল বীথির চোখে।

—যদি দিয়েই থাকি, কী হয়েছে তাতে? অমন ছোটলোকের মতো করছ কেন সেজন্যে?

এ ধরনের কথায় আর ধৈর্যচ্যুতি হয় না আমার—দিনের পর দিন প্রায় অকারণ কটু-কাটব্য শুনতে শুনতে এসবে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি সংযম হারালাম না। বললাম, দিয়েছ কিনা সেইটেই শুধু জানতে চেয়েছি, ছোটলোকের মতো কিছুই করিনি।

—না, করোনি? —বীথি তিক্ত গলায় বললে, তোমাকে যেন আমি আর চিনি না! কী মতলব নিয়ে কী কথা যে তুমি বলো সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

আমি থেমে গেলাম। এর পরে আর একটা কথা বাড়ানোর অর্থই হল খানিক কল্পনাতীত বিভীষিকার দৃশ্য সৃষ্টি করা। বীথি আর্তনাদ করবে, চাপা গলায় অবিশ্বাস্য ভাষায় অকথ্য গালাগালি করবে, আছাড় দিয়ে চুরমার করবে গোটা দুই কাচের গ্লাস। আর সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে হবে: কী ভয়ানক মানসিক নরকের মধ্যে আমায় বেঁচে থাকতে হবে—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর!

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি!

কিন্তু কেবল চল্লিশ টাকাই নয়। তারপরে প্রায়ই পনেরো-কুড়ি-ত্রিশ টাকার হিসেবে গরমিল হতে লাগল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোথায় যাচ্ছে এ-টাকা, কে নিচ্ছে। টাকাগুলো যে কোনোদিনই শোধ হবে না, সে সোজা কথা বুঝতেও আমার বাকী ছিল না।

তবু আমি সহ্য করে চলেছিলাম। শুধু একদিন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম: নিশিবাবু তো খুব ভালো ব্যবসা করেন শুনতে পাই, তবু তোমার খুকুদির এত টাকার দরকার হয় কেন?

—তা দিয়ে তোমার কোনো দরকার আছে?

ধারাল প্রশ্ন এল বীথির।

দরকার অনেক আছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা আমাকেই রোজগার করতে হয়, অনেক বিনিদ্র রাত্রির শ্রম, অনেক ক্লান্ত ক্ষুধার্ত

দিনের জ্বালা ওই টাকাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কাজেই ওদের সম্পর্কে প্রশ্ন করার নৈতিক অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার। কিন্তু বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে সে অধিকার আমি দাবি করতে পারলাম না।

কিন্তু একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

বীথির মামাতো বোনের বিয়ে। এ এক বিরক্তিকর সামাজিকতা, রক্ষা করতে খারাপ লাগে, আবার না করেও উপায় নেই।

বেরুবার মুখেই ঘটল ব্যাপারটা।

সাধারণত এসব লক্ষ্য করার অভ্যেস আমার নেই। কিন্তু সেদিন কী করে যে চোখে পড়ল সে আমি নিজেই জানি না।

বিশেষ একটা সখের হার ছিল বীথির। যে কোনো উৎসবে বেরুতে গেলে ওই হারটা সে পরতই। দামী জিনিস, অন্তত সাত আটশো টাকার কাছাকাছি। আজ সে হারটা দেখা গেল না বীথির গলায়!

—তোমার ও হারটা পরলে না?

বীথি ভ্রূকুটি করল : পুরুষ মানুষের সব জিনিসে অত নজর কেন? বেরুচ্ছ বেরোও।

কেন জানি না, হঠাৎ বিশ্রী একটা জেদ চাপল আমার। বললাম, না, সেই হারটাই তোমায় পরতে হবে।

বীথির চোখে-মুখে ঝড়ের পূর্বাভাস ঘনিয়ে এল : আমি পরব না।

—তার মানে? সে হারটাও তোমার খুকুদিকে দিয়ে রেখেছো নাকি?

প্রথম দিন যেমন মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আজও তেমনি ভাবেই ঠিকরে পড়ল কথাটা। কিন্তু ফল হল ভয়ঙ্কর। একটা টেবিলের কোণা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বীথি।

—হ্যাঁ, দিয়েছি। বেশ করেছি। আমার যা আছে সব দেব ওকে। আমার শাড়ী-গয়না সব দিয়ে দেব। কী করতে পারো তুমি?

আমার মাথায় এবার চড়াৎ করে উঠল রক্ত: অনেক কিছুই পারি। তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ বলেই আমি তোমার সে পাগলামি সমর্থন করব না। যাও—নিয়ে এসো হারটা।

—আনব না!—বীথি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: আনব না!

—তা হলে আমিই নিয়ে আসছি—বলে ঘুরে দাঁড়ালাম।

—খবর্দার—খবর্দার বলছি। —বীথির গলা থেকে বিকৃত আর্তনাদ বেরুল: এ ঘর থেকে এক পা যদি এগোও, আমি এই তেতলা থেকে সোজা বড় রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। অসভ্য—ইতর—ছোটলোক—

তারপরের দৃশ্যটুকু আর বর্ণনা করে লাভ নেই সুকুমার। সেই কদর্য হিংস্রতা, সেই কটু গালাগালি—সে অধ্যায়টুকু প্রচ্ছন্ন থাকাই ভালো। টেবিল থেকে নতুন কেনা টাইমপীসটাকে এক আছাড়ে চুরমার করল বীথি—বেরুবার জন্যে যে সিলকের শাড়ীটা পরেছিল, নখের আগায় সেটাকে ছিঁড়ল টুকরো টুকরো করে, একটা বন্দী বাঘের মতো দাপাদাপি করল কিছুক্ষণ, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু আমি তার মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ বীথির সমস্ত উন্মত্ততার মধ্যে আরো একটা কী যেন আগুনের চাবুকের মতো এসে আমায় আঘাত করল। চোখের তারা দুটো অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। নাসারন্ধ্রের দু' পাশ ফুলে উঠেছে—মুখের রঙ বদলাচ্ছে ঘন ঘন। এ তো শুধু নিউরোসিস্ নয়।

হঠাৎ যেন কেউ প্রবল একটা ঘা দিয়ে আমার বন্ধ দৃষ্টি খুলে দিলে। আমার ডাক্তারী অনুভূতি মুহূর্তে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। মনে পড়ল—আরো মনে পড়ল, আজকাল প্রায়ই রাতে ভালো করে ঘুমোয় না বীথি। ওঠে—অন্ধকার ঘরে পায়চারী করে বেড়ায়। প্রশ্ন করলে জবাব দেয়, বিছানায় বড্ড পিঁপড়ে উঠেছে—ঘুমুতে পারি না।

অথচ, আলো জ্বেলে বিছানায় একটি পিঁপড়ের সন্ধানও আমি পাইনি।

এ সব কিসের লক্ষণ ? কিসের ?

কিছুক্ষণ যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত কংক্রীটের মতো জমে গেল আমার। তার পরেই চোখে পড়ল টেবিলের ওপরে দুটো পান। খুকুদি'র পান। বেরুবার সময় খাবে বলে এনেছিল বীথি।

পান দুটো নিয়ে আমি তখনি চলে গেলাম ল্যাবরেটরীতে। তখন আমার পায়ের নিচে মাটি ছিল না, আকাশ ছিল না মাথার ওপর।

রেজাল্ট্ জানতে সময় লাগল না। একটু পরেই এল কেমিস্ট্।

—এ পান কোত্থেকে যোগাড় করলেন ?

—কী আছে ওতে ?—রুদ্ধ গলায় আমি প্রশ্ন করলাম।

কেমিস্ট্ জবাব দিলে, কোকেন।

জানতাম, আগেই বুঝেছিলাম। সোজা এসে খুকুদি'র ফ্ল্যাটের কড়া নাড়লাম।

খুকুদিই এসে সামনে দাঁড়াল। ভাগ্যিস বীথি সেখানে ছিল না—সে তখনো নিজের ঘরেই খিল বন্ধ করে পড়ে আছে। খুকুদি এক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকাল। তরল চঞ্চল চোখ দুটোয় যেন বিষের ঢেউ দুলে গেল চকিতের জন্যে। তারপরেই মোহিনী হাসি হেসে বললে, ডক্টর রায়—আপনি ? কী ভাগ্য আমার—আসুন—আসুন।

লোহার মতো শক্ত গলায় আমি বললাম, আপনার অভ্যর্থনা নেবার জন্য আমি আসিনি। আমি বলতে এসেছি, এ বাড়ি থেকে আপনি এক্ষুণি বেরিয়ে যাবেন।

—বেরিয়ে যাব ?

—হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবেন।

খুকুদি'র চোখে আবার নীল হিংসার ঢেউ খেলল। কিন্তু অবিশ্বাস্য সংযমের সঙ্গে খুকুদি বললে, আপনি আমার স্বামীও নন—বাড়ীওলাও

নন যে হুকুম করলেই এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। রোদে রোদে ঘুরে বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে আপনার। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা আপনার ফ্ল্যাট্ নয়—পাশেরটা।

—কোন্ ফ্ল্যাট্ আমার সে আমি জানি। আপনার স্বামী হওয়ার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি, সে-কথাও আমার মনে আছে।—খুকুদি'র মুখে আমি বজ্রদৃষ্টি ফেললাম: আমি বীথির স্বামী। আর এটাও আমার জানতে বাকী নেই যে, বীথিকে আপনি কোকেন ধরিয়েছেন। সেই সঙ্গে একে একে কেড়ে নিচ্ছেন তার টাকা, গয়না, মনুষ্যত্ব—তার সব।

ফণা-তোলা নাগিনীর মতো দুলছিল খুকুদি, এবার যেন শিকড় পড়ল মাথায়। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তবু হাল ছাড়ল না। পাংশু হাসি হেসে বললে, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন ডক্টর রায়?

—চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না।—ইচ্ছে করল খুকুদি'র গলাটা আমি টিপে ধরি: আমি পাগল হতে পারি, কিন্তু পুলিস নয়। আপনার ফ্ল্যাট্ সার্চ করলে কোকেন পাওয়া যাবে কিনা, সেটা তারাই বিচার করবে।

খানিকক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খুকুদি। ওর গলার একটা শিরা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। অদ্ভুতভাবে সেটা কাঁপছে, যেন মাথা-থ্যাঁতলানো একটা সাপ মোচড় খাচ্ছে অন্তিম যন্ত্রণায়। চাপা উত্তেজনায় খুকুদি'র ঠোঁট দুটো অল্প-অল্প নড়তে লাগল অনেকক্ষণ।

বললাম, আপনি যাবেন, না আমি পুলিসে খবর দেব?

খুকুদি বললে, পুলিসের দরকার নেই। আমি এমনি যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাব?

—সে কথা বলবার দায় আমার নয়। আপনার মামার বাড়ি, পিসের বাড়ি, জাহান্নাম—যেখানে হোক।

খুকুদি'র গলার শিরাটা শেষবার কেঁপে উঠল—দুই চোখে দেখা দিল হিংসার শেষ ফুলকি।

—পথ বাত্‌লে দিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। এখুনি যেতে হবে?

—এখুনি।

—আমার স্বামীকে কী জবাব দেব?

—আপনিই জানেন।

—যাবার আগে একটা স্যুটকেস্‌ নিয়ে যেতে পারি?

—হ্যাঁ—আপনার কোকেন-সুদ্ধ। কিন্তু এখুনি নিয়ে আসুন। আমি আপনাকে রাস্তায় ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসব। আর মনে রাখবেন, এ বাড়িতে যদি আর কখনো পা দেন—অন্তত পাঁচ বছর জেল খাটবার জন্যে তৈরী হয়ে আসতে হবে আপনাকে।

খুকুদি দেরি করল না। দু' মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল একটা চামড়ার স্যুটকেস্‌ নিয়ে।

রাস্তার ট্যাক্সি আমিই ডাকলাম। গাড়িটা চলে যেতে খুকুদি'র চাপা গলার শাসানি ভেসে এল শেষবার: জেনে-শুনে আপনি আগুনে হাত দিলেন ডক্টর রায়। আমাকে আপনি চেনেন নি।

পরে চিনেছিলাম। জেনেছিলাম, খুকুদি নিশিবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী নয়।

কিন্তু এ-সব কথা থাক সুকুমার। এই কুৎসিত অধ্যায়ের জের টানতে আর ভালো লাগছে না। শুধু পরের দিন অদ্ভুত কতকগুলো কাণ্ড করেছিল বীথি। একটা অসহ্য অব্যক্ত শারীরিক যন্ত্রণায় মেজেতে গড়াগড়ি খেয়েছিল, ঘামে ভিজে গিয়েছিল সর্বাঙ্গ, হাতে-পায়ে খিঁচুনি ধরেছিল। তারপর হঠাৎ উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর।

বাঘিনীর মতো আঁচড়ে আঁচড়ে মুখ রক্তাক্ত করে দিয়েছিল আমার। টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল এক গোছা মাথার চুল। আর ক্ষিপ্ত গোঙানির সঙ্গে বার বার বলেছিল, তুমিই খুকুদিকে তাড়িয়েছ বাড়ি থেকে—তুমিই।

একটা উপায় ছিল সুকুমার। বীথিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া যেত। কে নিয়ে যাবে ওকে হাসপাতালে? কে এগোবে

ক্ষুধার্ত বাঘিনীর কাছে? অতএব 'ভায়োলেণ্ট মেথড'ই ভালো—প্রকৃতিই ওর ব্যাধিমোচন করুক।

তিনদিন ধরে ওর অসহ্য যন্ত্রণা দেখলাম আমি। দেখলাম ঘন-ঘন মূর্ছা। তারপর আর সহ্য হল না। চতুর্থ দিন বিকেলে মাদ্রাজ মেলে উঠে ওয়াল্‌টেয়ার চলে গেলাম।

আদিত্য একবার থেমে গিয়েছিল। একটা সিগারেট বের করেছিল টিন থেকে, কিন্তু ধরায়নি। আঙুলের ফাঁকে সেটাকে আটকে রেখে বলেছিল, এতক্ষণ দীপার কথা তোমায় বলিনি। এইবারে বলব। একেবারে শেষ দৃশ্যে ও এসেছে—অথচ সব চাইতে বিয়োগান্তক ভূমিকাটাই ওর।

মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত ও আমার সহপাঠিনী ছিল, তারপর পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। মেয়েটাকে আমার ভালো লেগেছিল, ওরও হয়তো আমাকে খারাপ লাগত না। কিন্তু আমরা প্রেমে পড়িনি—সে-কথা মনেও ওঠেনি কোনোদিন। অন্তত আমার দিক থেকে তো নিশ্চয়ই নয়।

সেই দীপার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওয়াল্‌টেয়ারে। বেড়াতে গিয়েছিল।

নিজের সমস্ত মানসিক বিক্ষোভকে ভোলবার জন্যে দিন কয়েক এক সঙ্গে বেড়িয়েছিলাম দু'জনে। দীর্ঘ ছায়াকাঁপা তালবীথির ছায়ায় বসে, সমুদ্রের কলধ্বনি শুনতে শুনতে হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম—ওকে বলেছিলাম আমার কাহিনী। আকাশে দেখা দিয়েছিল এক টুকরো শ্রান্ত চাঁদ—সমুদ্র বিষণ্ণ কান্নায় ঝিমিয়ে পড়েছিল—'ডল্‌ফিন নোজের কালো ছায়াটা সমুদ্রের মধ্যে জেগেছিল প্রেতের মতো—আর দীপার শান্ত চোখ মৌন-করুণায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে টেলিগ্রাম এল। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করেছে বীথি।

কী জবাব দেব আমি কলকাতায় ফিরে? কী কৈফিয়ত দেব সমাজের কাছে? পোস্ট্‌মর্টেমে কোকেন সিম্‌টম বেরিয়ে আসবে—কোথায় লুটিয়ে যাবে বীথির সম্মান?

দীপা কি আমাকে আগেই ভালোবেসেছিল? অথবা সেই মুহূর্তেই প্রথম ভালোবাসল আমাকে? আমাকে প্রশ্ন কোরো না সুকুমার। মেয়েদের চরিত্র বোঝবার চেষ্টা অনেকদিন আগেই আমি ছেড়ে দিয়েছি।

দীপা বললে, আমিও আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাব আদিত্য-বাবু। একটা ডাব্‌ল বার্থ কূপে রিজার্ভ করুন।

—ডাব্‌ল বার্থ কূপে?

—তা ছাড়া উপায় কী আদিত্যবাবু? একমাত্র নিজের ওপর কলঙ্ক টেনেই আপনি স্ত্রীকে কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে পারেন!

—আর আপনি?

—আমি আপনার বন্ধু।

ডাব্‌ল বার্থ কূপেই পাওয়া গেল। দু'জনে দু'দিকের জানালায় মুখ রেখে সারাটা রাত নিঃশব্দে কাটিয়ে কলকাতায় এলাম। বিশ্বাস করো সুকুমার—সে রাত্রে বীথির কথা আমার একবারও মনে হয়নি—একবারও নয়। শুধু দীপার অন্ধকার প্রোফাইলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছি: ওকি আমাকে করুণা করছে—শুধুই করুণা?

আদিত্য আবার থেমেছিল।

—মেডিক্যাল্ কলেজে জানাশুনো ছিল, পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্টটা কাগজে আর বেরুল না। অবস্থা বুঝে পুলিসেও দয়া করল। তবে খুকুদিকে তারা আজও খুঁজছে—কোনোদিন পাবে কিনা জানি না। বিচিত্ররূপিনী খুকুদিকে অত সহজেই পাওয়া যায় না।

বীথির কলঙ্ক কেউ জানল না সুকুমার। কিন্তু চিহ্নিত হয়ে রইল দীপা। এখন ও প্রাইভেট্ নার্স। পেশেন্টের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই যোগাযোগ হয় ওর সঙ্গে। বার বার ভেবেছি, ওকে জিজ্ঞাসা করব ও আমায় ভালোবাসে কিনা। কিন্তু কী হবে জিজ্ঞাসা করে? আমিও ওকে ভালোবেসেছি কিনা—সে প্রশ্নের উত্তর তো আজও পাইনি!

আদিত্য শেষ করেছিল এখানেই।

ভেবেছিলাম, এ গল্প কাউকে বলব না। কোনো লাভ নেই—কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি নিজেই কি বিশ্বাস করতে পেরেছি! কিন্তু আজ যখন খবর এসেছে কন্টিনেণ্টে একটা প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছে আদিত্য, তখন মনে হল অন্তত দীপা মজুমদারের জন্যেও এ কাহিনী আমি প্রকাশ করব।

যদি এ সত্যি হয়, তা হলে দীপার দুটো কৃতজ্ঞ চোখের দৃষ্টি আমি অনুভব করতে পারছি। আর যদি মিথ্যে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী।' এক মিথ্যে দিয়ে দীপা বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল বীথির কলঙ্ক, আরেক মিথ্যে দিয়ে না হয় আদিত্য দীপাব কলঙ্ককেই আড়াল করে দিক।

হাঁস

গ্রামের নাম শোনা গেল জলসা।

এক চোখ বন্ধ করে, আর এক চোখে বন্দুকের নলটা খরদৃষ্টিতে পরীক্ষা করছিল বীরেশ্বর। লক্ষ্য করছিল রূপোর মতো উজ্জ্বল ব্যারেলের ভেতরে কোথাও এতটুকু মরচের কলঙ্ক রেখা জমেছে কিনা অথবা আটকে আছে কিনা বারুদের ছোট্ট একটি কণা। কিন্তু গ্রামের নামটা কানে যেতেই সকৌতুকে সে হেসে উঠল।

—জলসা! বাঃ, খাসা নাম। জলসার মতো জায়গাই বটে, যেমন জমজমাট।

শুধু বীরেশ্বর নয়, যে কেউ হলেই কৌতুক বোধ করত। খঞ্জের শ্রীচরণ কিংবা অন্ধের পদ্মলোচনের মতোই অবাস্তব নাম। জলসা বলা যায় বটে, কিন্তু সে কেবল আদিগন্ত মাঠের, নির্বাধ আকাশের আর নয় তো জড়াজড়ি করা অতিকায় কতগুলো প্রাগৈতিহাসিক অশথ বটের। জলসা ঘরের জমাট আর সংকীর্ণ অবসর নয়—একটা দূরায়ত অতি বিশাল পৃথিবী, যেখানে এসে দাঁড়ালে নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয়, তেমনি একটি অবারিত অবকাশ।

কিন্তু বীরেশ্বরের চোখে দার্শনিকতা নেই, আছে বিরক্তি। এমন জানলে সে আসত না। কাল সন্ধ্যেবেলায় চড়েছে গোরুর গাড়িতে, তারপর সারাটা রাত যেভাবে কেটেছে তাকে বলা উচিত দুঃস্বপ্ন। রেঙ্গুনে যাওয়ার পথে প্রথমবার সী-সিকনেস্ হয়েছিল তার—শক্ত মাটিতে পা দিয়েও সাতদিন ধরে সে ঘোর তার কাটেনি। কিন্তু

গোরুর গাড়ি! আটলান্টিকে সাইক্লোন উঠলেও তুলনা হয় না এর প্রচণ্ড দুলুনির সঙ্গে।

একবার উঠেছে হিমালয়ের চূড়োয়, পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে। শরীরটা টেনিস বলের মতো একবার ছইয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে, তারপরেই ধপাৎ করে পড়েছে বিছানায়। সে কী প্রলয়ঙ্কর ঝাঁকুনি! ছেলেবেলায় কিছুদিন এক্সারসাইজ করবার অভ্যাস ছিল ভাগ্যিস—নইলে সকালবেলায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে আর এক সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যেতো না বোধ হয়।

তবুও ভোর হল দুঃখের রাত্রি। ওরই মধ্যে ঝিম ধরেছিল কখন। একটা লালচে সাদা আলো চোখে পড়বার সঙ্গে এল এক ঝলক পদ্মবনের গন্ধ। ঢেউ-খেলানো মাঠের শেষে, আবছা সাদা আকাশের সীমান্তে ফুটন্ত পদ্মকলির মতো প্রথম সূর্য।

—আঃ—হাঃ হাঃ—কর্কশ স্বরে শাসন জানাল গাড়োয়ান। থেমে দাঁড়াল গাড়ি। হাতের পাঁচটা নামিয়ে গাড়োয়ান লাফিয়ে নামল, বললে, এসে গেছি বাবু।

—বাঁচালি বাবা—বীরেশ্বর উঠে বসল: উঃ, কী রাস্তা দিয়েই নিয়ে এসেছিস সারাটা রাত।

অপরাধীর মতো দাঁত বের করে হাসল গাড়োয়ান: এসব রাস্তা তো এমনি হয় বাবু।

—রাস্তা নয়, রাজপথ বল। আর তোর এই রাজরথ ছাড়া এ পথ পাড়ি দিতে পারত, এমন বাঘা ট্যাঙ্কও আজ অবধি জন্মায়নি। নেহাত সুকৃতি ছিল অনেক, তাই টিকে গেছি এ যাত্রা—নিজের রসিকতায় উদ্ভাসিত-মুখে খড়ের বিছানার নিচে জুতোজোড়া খুঁজতে খুঁজতে বীরেশ্বর বললে, কিন্তু আর সব গাড়ি কই? আসে নি এখনো?

—ওই তো বটগাছের নিচে। সবাই পৌঁছে গেছে বাবু।

এই দুর্গমপথের শেষে যে লক্ষ্যস্থল, তারই নাম জলসা।

গ্রাম ঠিক এখানে নয়, আধ মাইলটাক্ দূরে একটা টিলার

ওপর। প্রায়-যাযাবর 'বাদিয়া' মুসলমানদের খানকতেক খোড়ো চালা—তারই এই সম্মানিত নাম। হাসি পাবারই কথা।

তবু ঝাঁকড়া বটগাছের শিরশিরানি লাগা ঠাণ্ডা ছায়ার নিচে বসে নেহাত মন্দ লাগছে না। আকাশের সীমান্তে পদ্মকলির মতো সূর্যটা আগুনের পাপড়ি মেলছে একে একে। পদ্মবনের গন্ধ-মাখানো স্বচ্ছন্দ বাতাস আস্তে আস্তে ঝরিয়ে দিচ্ছে শরীরের গ্লানি। তার চেয়েও উপাদেয় লাগছে বড় ষ্টোভটার শোঁ শোঁ আওয়াজ আর সেই সঙ্গে সেদ্ধ ডিম আর আলুর ক্ষিদে-চাগানো সৌরভ।

মাটিতে একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে, তারই ওপরে আধখানা শোয়ার ভঙ্গিতে পাইপ টানছিল রজত। বললে, চোখ মেলে দেখে নাও বীরু। এমন নেচার আর কোথাও পাবে না বাংলা দেশে।

—মাপ করতে হবে ভাই, ওসব কাব্য নেই আমার মগজে। আমি স্রেফ বস্তুতান্ত্রিক। নেচারের চাইতেও চায়ের গন্ধটা অনেক বেশি লোভনীয় লাগছে আপাতত।

রজত বললে, কিন্তু সত্যি বলছি এমন মাঠ তুমি আর কোথাও দেখতে পাবে না। বিল, টিলা, বুনো ঘাস আর আকাশ। মাসে মাসে রূপ বদলায়। আমি যদি লেখক হতাম, তাহলে একখানা উপন্যাস লিখতাম এ নিয়ে।

প্রথম নলটি ছেড়ে তখন দ্বিতীয় নলে দৃষ্টি-নিবেশ করেছে বীরেশ্বর। হেসে বললে, তাতে আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এখনো আমি উপন্যাস পড়ি না—তুমি লিখলেও পড়তাম না। জীবনে ও কাজটি আমাকে দিয়ে সম্ভব নয়। অপব্যয় করবার মতো অত সময় মানুষের হাতে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

—শুধু টাকা টাকা করেই গেলে—ক্ষুণ্ণভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রজত।

আর একবার নিঃশব্দে হাসল বীরেশ্বর। বস্তুতান্ত্রিকের দরবারে চির-পরিচিত অভিযোগ। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হয়, কিন্তু

বীরেশ্বর জানে এর পিছনে ঈর্ষ্যা লুকিয়ে আছে একটা। তীক্ষ্ণ সূচীমুখ। টাকা করতে না পারার পেছনে মহত্ত্ব নেই, আছে অযোগ্যতা। প্র্যাক্‌টিকাল্‌ না হতে পারাব অক্ষমতার ওপর মানুষ চড়িয়েছে দার্শনিকতার রঙ ; ঘুষ খেতে না পারার ভীরুতাকে স্বর্গীয় করে তুলেছে নীতিকথার নামাবলী জড়িয়ে। রজতও এর ব্যতিক্রম নয়। কলেজ-জীবনে সহপাঠী ছিল দু'জনে—এক হষ্টেলে একই খরচায় থেকেছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরেরছেলের মতো, একই সঙ্গে বি, এ ফেল করেছে, একই সঙ্গে নেমেছে বাঁচবার লড়াইয়ে। কিন্তু দার্শনিক রজত এই সাত বছর চাকরির পরে পেয়েছে তিরিশ টাকা ইনক্রিমেণ্ট, আর বস্তুতান্ত্রিক বীবেশ্বর ত্রিশ হাজার টাকা এখন ধুলো মুঠোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে আকাশে।

ইতিমধ্যে চা আর খাবার নিয়ে এল চাকর দুটো।

বীরেশ্বর বললে, হ্যাঁ, এইবারে জলসা জমেছে বটে। চটপট শেষ করে নাও রজত—আর দেরী নয়।

আলগাভাবে চায়ে চুমুক দিলে রজত : এই বেশ ভালো লাগছে ভাই, এখন আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে না বনে বাদাড়ে।

বীরেশ্বব ধমকে উঠল : রাখো তোমাব কাব্য। সারাবাত কাল যে দুর্ভোগ গেছে, থলে না ভরলে খেসারত পোষাবে না তার। উঠে পড়ো এখন।

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণভাবে সে তাকাল আকাশের দিকে। ছেঁড়া ছেঁড়া উজ্জ্বল মেঘের তলা দিয়ে দ্রুতচারী কলকূজন আসছে বিসর্পিত হয়ে। একটা ছুটন্ত হরতনের টেক্কার মতো গতিশীল ব্যূহ রচনা করে উড়ে যাচ্ছে বনহংসের দল। কোন সুদূর শৈলসরোবরের থেকে পাখা মেলে কত সমুদ্র আর অরণ্য পাড়ি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে এসেছে বাংলা দেশের বিলে ; বিশ্রাম নিতে এসেছে কালচে সবুজ পদ্মপাতার নিচে, বেগুনে ফুলে আলো হয়ে যাওয়া কলমীলতার ঝোপে ঝাড়ে ; ঘরছাড়া বেদের মতো শীতের টোল পাততে এসেছে নল-ঘাসের নিভৃতিতে।

মুখের ভেতরের প্রায় গোটা ডিমটাকে উত্তেজনার চোটে গিলে ফেলল বীরেশ্বর ঃ কী হাঁস ওটা হে ?

রজত বললে, লালশর বলেই তো মনে হচ্ছে।

—লালশর ? ভালো ?

—হাঁসের রাজা। —চায়ের কাপ নামিয়ে রজত আবার ধরালো পাইপটা ঃ সলিড মাংস, লোহার মতো ওজন।

—লা গ্র্যাণ্ডি ! লোভে আর উৎসাহে চকচক করে উঠল বীরেশ্বরের চোখ ঃ কোথায় পড়বে ?

—দেখে তো মনে হচ্ছে চন্দনার বিলে নামবে। শুনলাম হাঁসের মচ্ছব পড়েছে ওখানে।

—বটে ! ওঠো, ওঠো তা হলে—দাঁড়িয়ে পড়ল বীরেশ্বর, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল গোটাকতক। অপসৃয়মান হরতনের টেক্কার দিকে দৃষ্টিটাকে সঞ্চালিত করে দিয়ে বললে, আর দেরী নয়।

বন্দুক কাঁধে তুলে, চাকরের হাতে ব্যাগ আর চায়ের ফ্লাস্ক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। শুধু একজন চাকর রইল এখানে, তত্ত্বাবধান করবে জিনিসপত্রের, রান্না করে রাখবে।

ঘাসবন ঠেলে, শুকনো নালা পেরিয়ে টিলার পর টিলা ডিঙিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। শীতের স্নিগ্ধতা জড়ানো শেষ হেমন্তের রোদ কিন্তু গায়ে লাগছে না, অজস্র বাতাসে যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে তার তাপ। ঢেউ খেলছে ঘাসবনে। ওদের পায়ের সাড়া পেয়ে একটা টিলার ওধার থেকে ঝটপট করে আকাশে উড়ল এক ঝাঁক মেটে রঙের 'বগেরি' পাখী—যেন হঠাৎ শিমুল ফল ফেটে গিয়ে তুলোর রাশ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে বাতাসে।

ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে বন্দুকটা সরিয়ে নিয়ে রজত বললে, ভালো কথা, সেই সুরমা রায়ের খবর কি হে ?

চলতে চলতে আচমকা যেন পা থেমে গেল বীরেশ্বরের, হঠাৎ যেন ইটের হোঁচট লাগল বুড়ো আঙুলে। আচমকা হমুছটো শক্ত হয়ে উঠল চোখের ছায়ায়।

কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

পরক্ষণেই স্বচ্ছন্দ হাসি আভাসিত হয়ে উঠল বীরেশ্বরের মুখে ঃ খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছি।

—মানে? ভ্রূ দুটো সংকীর্ণ হয়ে এল রজতের।

—টীকা করবার দরকার আছে? তাকে ছেড়ে দিয়েছি—মুক্ত আকাশে উড়ছে এখন।

—তোমার এইগুলোই আমার ভালো লাগে না—অনুযোগের সুর ফুটে বেরুল রজতের গলায় ঃ অত্যন্ত অন্যায়।

নিরুত্তরে হাসল বীরেশ্বর।

রজত আবার বললে, কখনো বাধে না মনের ভেতর?

—তোমার বাধে এই হাঁস শিকার করতে?—পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল বীরেশ্বর।

—ঠিক হল কি তুলনাটা? রজত অনুযোগ করল।

—একই ব্যাপার। পার্থক্যটা গুণগত নয়, পরিমাণগত—দার্শনিক না হয়েও বীরেশ্বর দার্শনিক ভঙ্গিতে জবাব দিলে।

কথা বললে না রজত, চলতে লাগল নিরুত্তরে। নিচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছেড়ে দিলে আবার। একবার নয় দু'বার নয়, অন্তত তিন তিনবারে ঘটনা চোখে পড়েছে রজতের। এ এক অদ্ভুত খেলা বীরেশ্বরের, অমানুষিক আনন্দ। হাতের মুঠোয় দিনকতক নাচিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া পথের কাদার মধ্যে। আবার নতুন পুতুলের পালা তারপরে। একটা ক্রূর হিংসা লিক্ লিক্ করে গেল রজতের মাথার ভেতরে, ইচ্ছে করল এই নির্জন মাঠের সুযোগে একটা গুলি করে বসে বীরেশ্বরের অবজ্ঞা-কুঞ্চিত কপালে।

আর কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বীরেশ্বর। না, সুরমা রায় নয়, মনে পড়ছে মনীষা মিত্রকে। কালো রোগা চেহারার মেয়ে—চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্ত অবসাদ। নিজের মূল্যহীনতা সম্পর্কে করুণভাবে সচেতন। যদিও কিছুটা ভরসা ছিল, গালভরা ব্রণের শুকনো ক্ষতচিহ্নগুলো সেটুকুও দিয়েছে নির্মূল করে।

প্রথম পরিচয়ে কৌতুক ছলকে পড়েছিল বীরেশ্বরের চোখ দিয়ে। কঠিন পরীক্ষা সন্দেহ নেই। কিন্তু কলেজ-জীবনে অভিনয় করে মেডেল পেয়েছিল সে—সামলে নিলে মুহূর্তের মধ্যে। বলেছিল, ভারী খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। একটু চা খাওয়াতে হবে।

চা খাইয়েছিল বই কি মনীষা মিত্র। কিন্তু সে শুধু আরম্ভ—শেষ নয়। একই পথ দিয়ে এল অনেক সকাল, অনেক সন্ধ্যা, অনেক বৃষ্টি-ঝরা দুপুর। নীল বাল্‌ব জ্বালা ঘরে সেতারে সেই মোহিনী রাগ বাজানো যেন স্বপ্নের মতো মনে পড়ে এখনো ; মনে পড়ে জানলা দিয়ে হঠাৎ আসা রাঙা আলোর রঙে অতি কাছের মুখখানাও হারিয়ে যায় কী আশ্চর্য সুদূরতায়!

সেই প্রথম। প্রথম বন্দুক ছোঁড়া। শুধু হাঁসই পড়েনি—নিজের বুকেও কুঁদোর ধাক্কা লেগেছিল একটা। হঠাৎ যেন ভাবতে ভালো লেগেছিল যদি এই মেয়েটিকে সত্যি সত্যিই—

কিন্তু বেশীক্ষন থাকেনি সেটা। পাকা শিকারী হয়ে যে জন্মেছে, একটা হাঁসের দু' ফোঁটা রক্ত দেখেই দুঃখবাদের বিলাস করলে চলে না তাকে। কালো কুরূপা বোনটা সম্পর্কে অতখানি দুর্বলতা না থাকলে কি এক কথায় ত্রিশ হাজার টাকা ঢালতে রাজী হত অশোক মিত্র—রাজী হত শেয়ার মার্কেটের অমন ঝানু স্পেকুলেটার?

—ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যা—

উদ্‌গ্রীব 'কাগের' ডাকে চট্‌কা ভেঙে গেল। জলাভূমির প্রতিহারী। সারসের মতো দীর্ঘ গলাটাকে আকাশে তুলে রেখে লক্ষ্য করে শিকারীর গতিবিধি। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই কর্কশ গলার প্রচণ্ড চিৎকারে সচেতন করে দেয় নিশ্চিত বনহংস আর জলপিপিদের।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রজত।

—বীরু, বি রেডি! এখানেও পাখি পড়েছে। ওই কোণার দিকটায় গোটাকয়েক 'ক্যাটকেঁটিয়া' রয়েছে মনে হচ্ছে যেন।

চিন্তার আচ্ছন্নতাটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কুয়াসা হয়ে। কাঁধের

সঙ্গে ফিতের ঝোলানো দূরবীণটা তুলে নিয়ে দৃষ্টি দূরান্বিত করলে বীরেশ্বর। 'ক্যাঁটকেঁটিয়া'ই বটে।

ছোট এক ফালি জলা। ঘাস রয়েছে, কলমীদাম রয়েছে, টুকরো টুকরো ডাঙাও জেগে রয়েছে মধ্যে মধ্যে। তারই ওদিকটার কোণায় নির্ভয়ে পক্ষ-বিধুনন করছে ছোট একটা হাঁসের পাল। নিভৃত প্রেম, নিঃশঙ্ক বিশ্রাম।

— বসে পড়ো, বসে পড়ো—চাপা গলায় নির্দেশ দিলে রজত।

হাঁটু ভেঙে তিনজনেই বসে গেল ঘাসবনে। 'কাগ্‌টা' আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করে উঠে সজাগ করে দিতে চাইল সকলকে। হাঁসের দলটা একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠল একবার—পরক্ষণেই স্বচ্ছন্দমনে জলক্রীড়া করতে লাগল। এত সহজেই নড়তে ইচ্ছে করছে না—ওদের পাখায় এখনো সপ্তসমুদ্র পার হয়ে আসার ক্লান্তি।

ততক্ষণে হিংস্র আস্থিরতায় কাঁধ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে ফেলেছে বীরেশ্বর। ট্রীগার তুলে দিয়ে দুটো চাব নম্বর ভবেছে নলেব মধ্যে। আলগোছে ঘাসের বন সরিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঠিক করলে লক্ষ্য।

রজত হাসল : পাবে রেঞ্জের মধ্যে ?

ফিস্‌ফিসানি গলায় ঘাতকের মত্ততা মিশল বীরেশ্বরের : পাব না, বলো কী ! নতুন বি-এস-এ বন্দুক--রাইফেল রেঞ্জ ! দাঁড়াও—দাঁড়াও—চুপ—

ফ্লাইটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রেখে পর পর দুটো ট্রীগারই টেনে দিলে বীরেশ্বর। উগ্র ভয়ঙ্কর শব্দে নীলাঞ্জন নির্মল আকাশটা হঠাৎ ফেটে চৌচির হয়ে গেল যেন—বারুদের গন্ধে কটু হয়ে গেল পদ্মবনের সুরভি। চারদিকে ভয়ার্ত কলরবে হাজার হাজার পাখী শূন্যে ডানা মেলে দিলে এক সঙ্গে। ঢেউ-খেলানো ঘুমন্ত মাঠের হৃৎপিণ্ডটা দোলা খেয়ে উঠল ঝড়ের বেগে।

বন্দুক নামিয়ে রুমাল দিয়ে কপালটা মুছল বীরেশ্বর : পড়েছে ? রজত হাসছিল।

—পড়বে না ? পাকা হাত তোমার—কোনো লক্ষ্য তো ব্যর্থ হয়নি আজ পর্যন্ত।

গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল চাকরটা। এক কোমর জল আর কাদা ভেঙে তুলে নিয়ে এল শিকার। দুটো পড়েছে। একটার পা আর পাখা ভেঙেছে, অন্তিম চেষ্টায় হাতের মধ্যে ঝট্পট্ করছে তখনো। আর একটার গলার ভেতর দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেছে, ঝুলে পড়েছে রক্ত-মাখানো ভাঙা ঘাড়, নীল চোখের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গেছে মৃত্যুর সাদা পর্দা ; ঠোঁটের কোণে একটি কচি ঘাসের শীষ্ ঝুলছে—শেষ গ্রাসটাও খেয়ে যেতে পারেনি আর। বিনা বাক্যব্যয়ে দুটোকেই সে বস্তায় পুরে ফেলল।

এবার বীরেশ্বরও হাসল।

—নট ব্যাড্। আরম্ভটা যখন ভালোই হ'ল, তখন শিকার মন্দ হবে না আজ। চলো, এগোনো যাক্।

আবার ঘাসবন, উঁচু নীচু পথ, শুকনো নালা আর সীমাহীন মাঠ। নতুন জলা, নতুন শিকারের সন্ধান। কাছাকাছি আর হাঁস মিলবে না আপাতত—বন্দুকের শব্দে পালিয়েছে দূরে দূরে।

রজত পাইপ ধরালো, সিগারেট জ্বালিয়ে নিল বীরেশ্বর। শীতের স্নেহ-মাখানো রোদটা চড়া হয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে। পদ্মবনের গন্ধটা ফিকে হয়ে গেছে গরম হয়ে আসা বাতাসের ঝাপটায়। পদ্ম-কলির মতো সূর্যটা এখন প্রখর আর প্রচণ্ড।

হ্যাঁ—আরম্ভটা ভালো হ'লে মন্দ হয় না শেষ পর্যন্ত। তার প্রমাণ মনীষা মিত্র। বোনের মুখ চেয়েই অশোক মিত্র লিখে দিয়েছিল ত্রিশ হাজার টাকার চেক্টা—রাজি হয়েছিল পার্টনারশিপে। সেই টাকাতেই কপাল খুলল বীরেশ্বরের। তারপরেই একদিন জাল গুটিয়ে বোম্বাই।

না, সে তো ফাঁকি দেয়নি অশোক মিত্রকে। প্রফিট্ দিয়েছে সেণ্ট পার্সেণ্ট। কিন্তু তবু কেন তাকে খুন করতে চায় অশোক ? মনীষার যদি ইন্‌স্যানিটি দেখা দিয়ে থাকে তার জন্যে সে কি দায়ী ? সে কি

দায়ী যে সে রূপবান, বুদ্ধিমান আর কথাকুশল? দুদিন একটু অন্তরঙ্গভাবে মিশেছে বলেই যে সে প্রেমের তুফানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, এমন সিদ্ধান্ত করবার কারণই বা ঘটে কোথা থেকে?

—বীরু?

আবার পরিবেশ সচেতন করে তুলল রজত: চা খেয়ে নেবে একটু?

— আপত্তি নেই। অনেকটা তো হেঁটেছি, আরো অনেক হাঁটতে হবে বোধ হয়। একটু বল সঞ্চয় করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ— উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়েও গলার স্বরে অন্যমনস্কতা ফুটিয়ে তুলল বীরেশ্বর।

—তা হলে বসা যাক এইখানেই—

প্রায় মজে যাওয়া একটা দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর ছাতিম গাছের নিচে বসল ওরা। গৌড়ের বিলুপ্তপ্রায় হিন্দু-ইতিহাসের যুগে হয়তো সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এই মহা-প্রান্তরের বুক জুড়ে, তারই স্মরণ চিহ্ন এই দীঘিটি। একটা ভাঙা পাথরের টুকরোর ওপরে আরাম করে বসল বীরেশ্বর।

চাকরটা চা ঢেলে দিলে দুটি পেয়ালায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার তেমনি একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে বন্ধুব মুখের দিকে তাকাল রজত।

—দিনকয়েক আগে শোভনার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল আমার।

—ওঃ!—চোখ দুটোকে সংকীর্ণ করে বীরেশ্বর বললে, তাই নাকি? বেশ, সুখী হলাম শুনে।

—ঠাট্টা করছ?—একটা বিদ্বেষের জ্বালা ফুটে বেরুল রজতের চোখমুখ দিয়ে।

—না, ঠাট্টা নয়। আমি ভাবছি—ক্ষুরধার হয়ে উঠল বীরেশ্বরের কণ্ঠ: নিঃস্বার্থভাবে পরের খোঁজ করে বেড়ানোটা আজকাল তোমার একটা সখে দাঁড়িয়ে গেছে।

রজতের চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য: কথাগুলো কি তুমি উড়িয়ে দিতে চাও?

—উড়িয়ে দিতে চাই না—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আপনিই উড়ে গেছে তারা। —তেমনি ধারালো হয়ে এল বীরেশ্বরের উত্তর।

—কিন্তু—

—ইচ্ছে করলে ওই সব 'কিন্তু'র বোঝা তুমি কাঁধে বয়ে বেড়াতে পারো। আমি পারি না, কারণ আমার সময় মূল্যবান, অবসর কম। তা ছাড়া 'সারমনে'র বয়স আমার পেরিয়ে গেছে সেটাও জানো বোধ হয়।—বিরক্তি, অস্বস্তি আর অসহিষ্ণুতায় শেষ কথাগুলো পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠল বীরেশ্বরের।

এবারেও চুপ করল রজত। এ সব আলোচনা বীরেশ্বর পছন্দ করে না, তা সে জানে, কিন্তু জেনেও সামলাতে পারে না নিজেকে। থেকে থেকে জ্বালার মতো এগুলো যখন তখন ফুটে বেরোয়। বন্ধুত্বের সমস্ত প্রীতির সম্পর্ক ছাড়িয়েও একটা ঘৃণার বিষে-কালো হয়ে ওঠে মন। হঠাৎ যেন বীরেশ্বরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আক্রমণ করতে ইচ্ছে জাগে তার। এই নির্জন মাঠের সুযোগ নিয়ে সাপের মতো একটা জিঘাংসা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে চায় চেতনার ওপর দিয়ে।

দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়ে কর্কশভাবে বীরেশ্বর বললে, না, এভাবে বসে বসে আড্ডা দিলে চলবে না। এখনো তো লালশরের খোঁজ পাওয়া যায়নি। লালশর না নিয়ে ফিরব না আজকে।

—চলো—নিষ্প্রাণভাবে ঠোঁট নাড়ল রজত।

সূর্যের তাপে তেতে উঠেছে মগজ, উত্তাপ সঞ্চিত হতে লাগল চিন্তাতেও। শোভনা! কিন্তু কী দোষ ছিল বীরেশ্বরের? গায়ে পড়ে এসেছিল মেয়েটা। ওকে জড়িয়ে ধরেছিল অক্টোপাসের মতো। আফিসে পর্যন্ত ধাওয়া করত তার। বিরক্তি বোধ করেছে বীরেশ্বর, কখনো কখনো রাগে জ্বালা করে গেছে ব্রহ্মরন্ধ্র; কখনো বা মনে হয়েছে একটা ভিজে দড়ির মতো মেয়েটা লেপ্টে রয়েছে তাকে, দূর করে দিতে পারলে রক্ষা পাওয়া যায়।

—চলো না, সিনেমায় যাই আজ। ভালো বই রয়েছে।

—আজ সময় হবে না লক্ষ্মীটি, বিকেলে জরুরী এন্‌গেজমেণ্ট রয়েছে গোটাতিনেক।

—আমার চেয়েও কি বেশি হল এন্‌গেজমেণ্ট ?—তুলি-বুলোনো ভ্রূরেখা বাঁকিয়ে বিলোল কটাক্ষ হানতে চেয়েছে শোভনা : এমন সুন্দর সন্ধ্যায় কণ্ট্রাক্ট খোঁজার চাইতে কি হাওয়াই দ্বীপের স্বপ্ন ভালো লাগবে না তোমার ?

মেয়েটার ন্যাকামি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত আর বিরক্ত বীরেশ্বর রূঢ়তম মন্তব্য করে বসতে চেয়েছে একটা। কিন্তু বেধেছে। বেধেছে শিভাল্‌রিতে, পুরুষের পৌরুষে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, আচ্ছা চলো।···

—বীরু, ওদিকে, ওদিকে। 'সরালি'র একটা বড় ঝাঁক পড়ল মনে হচ্ছে।

চকিতে কাঁধ থেকে বন্দুক নামাল বীরেশ্বর। টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে শিকারীর রক্ত। চারদিকে ছোট বড় রাশি রাশি জলা, আর তাতে অজস্র হাঁস পড়েছে এবার। নতুন-কেনা বি-এস-এ বন্দুকটার পয় ভালো সন্দেহ নেই।

—কোনটার কথা বলছ ?

—ওই বাঁয়ে। বাবলা বনের পাশ দিয়ে ওই বড় জলটাতে। আস্তে, আস্তে, গুড়ি মেরে এসো। বেশি ঘাস নেই এখানে—টের পেয়ে যাবে।

এবারে দুটো বন্দুকই গর্জন করল এক সঙ্গে। খট্ করে ট্রীগার তোলবার আওয়াজ পেয়েই হাঁসগুলো উড়তে আরম্ভ করেছিল—ফ্লাইং ফায়ার করল দু'জনে। করুণ চিৎকারে আকাশ আকুল করে আরো দুটো পাখি ঘুরতে ঘুরতে পড়ল বিলের কাদাজলে। একটা পড়েই ডুবে গেল—মিনিট তিনেক পরে খানিক দূরে নিঃসাড় হয়ে ভেসে উঠল আবার। ঘোলাজলের ওপর তেলের মতো ভাসতে লাগল আহত বুকের এক ঝলক ঘন রক্ত।

বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে এক-এক পা করে সরে

যাচ্ছে সূর্য। এসেছে মাথার ওপর—সেখান থেকে ঝুঁকে পড়েছে পশ্চিমের রেখায়। সাদা আলো সোনালী হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

চাকরটার কাঁধের বস্তাটা ভারী হয়ে উঠেছে, আশার চাইতে অনেক বেশি পাখী মিলেছে আজ। তিনদিন ধরে খেলেও ফুরবে না। তবু ফিরতে পারছে না বীরেশ্বর। নেশা ধরেছে—খুনের নেশা। প্রয়োজনের তাগিদ নেই—শুধু অবিমিশ্র হত্যার আনন্দ এখন।

শোভনা! মনের সুর কেটে যাচ্ছে থেকে থেকে। শোভনা মনীষা নয়—দুর্বলতা জাগেনি এক বিন্দুও। তার নামাতেই চেয়েছিল বীরেশ্বর—মুক্তি চেয়েছিল গায়ে-পড়া মেয়েটার এই দুঃসহ সাহচর্য থেকে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের সমস্ত অপূর্ণ কামনার সঞ্চিত লোভ-গুলোর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল সে। বিলিতী হোটেল থেকে নাইট ক্লাবে। দামী খাবার থেকে দামী ওয়াইনে।

তারপরে আর বেশী কিছু করতে হয়নি তার। গুরু-মারা বিদ্যা আয়ত্ত করতে মাত্র মাসখানেক সময় নিয়েছিল শোভনা। পাঁকের থেকে অকলঙ্ক দেহে পাঁকাল মাছের মতো বেরিয়ে এল বীরেশ্বর, কিন্তু শোভনা তলিয়ে গেল নিশ্চিহ্নভাবে। দুশ্চরিত্র মাড়োয়ারী ছোকরাটা অবশ্য অসীম কৃতজ্ঞ হয়েছিল তার ওপর। বহু সুযোগ করে দিয়েছিল—সিনেমা আর নাইট ক্লাবের খরচ উশুল হয়ে গিয়েছিল হাজার গুণ।

অন্যায়? রজত তাই বলে। বিতৃষ্ণ ঘৃণায় বীরেশ্বরের ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বন্দুকের সামনে ইচ্ছে করে যে পাখিটা এসে দাঁড়ায় তাকে শিকার না করা নির্বুদ্ধিতা। আর যাই হোক, নির্বোধ নয় বীরেশ্বর। তার মাংস নিজে না খাক, ভেট পাঠিয়ে কাজ এগিয়ে রাখা চলে।···

—ওগুলো কি হাঁস রজত?—বীরেশ্বর থেমে দাঁড়াল।

—দীঘলি। মানে গলাটা খুব লম্বা বলে ওই নাম। কিন্তু ভালো পাখী।

বি-এস্-এর উত্তপ্ত নলের মধ্যে আবার ঢুকল দুটো চার নম্বর।

—ওই যাঃ—উড়ে গেল—

—আজ আর থাক বীরু। —ক্লান্ত গলায় রজত বললে, অনেক তো হল, এবার ফেরা যাক।

—ক্ষেপেছ! লালশর পাওয়া যায়নি এখনো।

—আর একদিন হবে না হয়। বেলা পড়ে আসছে।

—সে কি হয়?—বীরেশ্বর কঠিন মুখে বললে, লালশর না নিয়ে আমি ফিরব না। কিন্তু—ওকি, ওগুলো কী ওদিকে?

অনেকটা দূরে একখণ্ড বিল পড়ন্ত রোদে বিরাট একখানা আয়নার মতো জ্বলে উঠেছে। ঘাস আর কলমীদাম খুবই সামান্য—একটা প্রকাণ্ড দীঘির মতো আর মনোরম। তারই মাঝখানে স্বচ্ছন্দ আনন্দে অসংখ্য হাঁস সাঁতরে ফিরছে—হ্যাঁ, লালশর। কোনো ভুল নেই, লালশরই বটে।

রজত বললে, হোক লালশর। আর পারছি না হাঁটতে। প্রায় মাইল আটেক পথ ঠেঙিয়েছি, পা টনটন করছে এখন।

—তা হলে তোমরা বোসো এই বটগাছটার কাছে। আমি ফিরছি লালশর নিয়ে।

ঘাসবনের মধ্য দিয়ে একাই এগিয়ে চলল বীরেশ্বর। জীবনে যা চেয়েছে, তাই পেয়েছে সে—নিজের জোরে আদায় করে নিয়েছে পৃথিবীর কাছ থেকে। লালশব না নিয়ে আজও সে ফিরবে না।

ক্যাটকেঁটিয়া, দীঘলি, সবালি, জলপিপি, চীনে হাঁস। মনীষা মিত্র, শোভনা চক্রবর্তী, সুষমা রায়, মঞ্জু দত্ত। কোনো পার্থক্য নেই, তফাত নেই বিন্দুমাত্রও। নিজের যুক্তিটাই মনের কাছে বাজছে বীরেশ্বরের। পার্থক্যটা গুণগত নয়, পরিমাণগত। আধ সের মাংস আর একটা মোটা টাকার চেক, একই প্রয়োজনের দুটো রূপ।

না, সে স্কাউণ্ড্রেল নয়—বখামি করবার সময় নেই তার। সোনার রূপ যে দেখেছে, তার সে সাধনাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে কোন্ স্বর্ণাঙ্গী? গোখরো সাপের বিষের মতো টাকার নেশা যাকে

ধরেছে, তাকে লুব্ধ করতে পারে এমন সোমরস সৃষ্টি হয়নি আজ পর্যন্ত!

এতক্ষণ রজতের সাহচর্য একটা অবাঞ্ছিত বিবেকের মতো ভার হয়ে চেপেছিল মনের ওপর। এইবার নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজেকে যেন ফিরে পেল বীরেশ্বর। নিজে কৌতুকে হেসে উঠল হা-হা করে।

কিন্তু ভুল হয়ে গেল। বিলটার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে—খেয়ালই ছিল না সেটা। সমস্ত জলাভূমিকে সন্ত্রস্ত করে প্রতিহারী 'কাগ' সাড়া দিয়ে উঠল ক্যাঁ ক্যাঁ করে—বন্দুকের রেঞ্জ পাওয়ার আগেই আকাশে দ্রুতগতিতে ডানা মেলল লালশরের দল।

—পালাল!

কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বীরেশ্বর, তারপরেই দীপ্ত হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। না, বেশী দূর যায়নি। আধ মাইলটাক উড়ে গিয়েই পড়েছে আবার।

দ্রুতপায়ে সে এগিয়ে চলল।

কিন্তু আশ্চর্য চালাক লালশরের দল। কী করে টের পেল কে জানে—এবারও উড়ল। দূরে গেল না, ওদিকে একটা জলার মধ্যে গিয়ে নামল ঝুপঝাপ শব্দে।

বেলা পড়ে আসছে—সূর্য লাল হয়ে এসেছে পশ্চিম আকাশে। দূর থেকে রজতের ডাক মাঠের বাতাসে ভেসে এল: বীরু, ফেরো এবা-র—বী-রু—

সাড়া দিলে না বীরেশ্বর। উগ্র ভয়ঙ্কর জেদ জেগেছে একটা। মঞ্জু দত্তও ঐ লালশরের মতো বেগ দিচ্ছে তাকে, পিছলে পিছলে যাচ্ছে হাতের মুঠো থেকে। তাকে না হলে বাগানো যাবেনা বুড়ো রায় বাহাদুরকে। নাউ অর নেভার! লালশরগুলো আজ ফাঁকি দিলে কাল মঞ্জুও যে এমনি ফাঁকি দেবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? ফিরবে না বীরেশ্বর, ব্যর্থ হয়ে কিছুতেই সে ফিরবে না আজকে।

সূর্য লাল হয়ে ডুবতে লাগল পশ্চিমের আকাশে। লালশরের ঝাঁক ক্রমাগত লুকোচুরি খেলতে লাগল যেন সীমাহীন কৌতুকে।

কঠিন মুঠিতে বন্দুকটা ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলল বীরেশ্বর। আর উঁচু একটা টিলার ওপর উঠে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল রজত।

—বীরু, বীরু—বী-রু—

দীর্ঘ ঘাসবন আর আদিগন্ত জলার বুক থেকে সে ডাকের সাড়া ফিরে এল না। তালবনের মাথায় সূর্য ডুবল—আকাশজোড়া অন্ধকারের পাখা একটু নামতে লাগল মাঠের ওপর। দিনের চোখ-ভোলানো অপরূপ প্রকৃতির ওপর আসন্ন সন্ধ্যা থম থম করে উঠল বিভীষিকার মতো, প্রেতের নিঃশ্বাসের মতো হু হু করে উঠল হাওয়া, অশুভ হাসির মতো বহু দূরে ধ্বক করে জ্বলে উঠল একটা নীল পিঙ্গল আলেয়ার আলো।

তখন ছিল লালশরের ঝাঁক, এখন আলেয়া।

এই অচেনা দেশে—এই দিগ্‌দিগন্ত জোড়া মাঠের মধ্যে পথ হারিয়েছে বীরেশ্বর। কত দূরে সে চলে এসেছে, জলসার সেই বটগাছের নিচে কোথায় তাদের ক্যাম্প—তার কিছুমাত্র হদিস খুঁজে পাচ্ছে না সে।

লালশর পাওয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আর লালশর চায় না বীরেশ্বর। ফিরে যেতে চায় ক্যাম্পে। শিকার করতে চায় না—আশ্রিত হতে চায় মানুষের মধ্যে।

ঝোঁকের মাথায় ক' মাইল পথ যে এগিয়ে এসেছে, তা কি জানে? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা বসে গেছে, কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি রজতের। গ্রামের আলো ভেবে চারদিকে সে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাছে গেলেই সে আলোর চিহ্নমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না আর। আলেয়া! অন্ধকার মাঠ জুড়ে মায়া-রাক্ষসীর সঞ্চার যেন।

আলেয়া জ্বলছে—পথ-ভোলানো সর্বনাশা আলেয়া। পূবে, পশ্চিমে, উত্তর, দক্ষিণে। থেকে থেকে বসে পড়ছে বীরেশ্বর, অসহ্য ক্লান্তিতে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে কুকুরের মতো। অন্ধকারে মুখর

হয়ে উঠছে বন-হংসের ডাক, সেই লালশরগুলোই হয়তো! সামনে পিছনে, দূরে কাছে নিষ্ঠুর নির্দয় হাসি হাসছে নীল পিঙ্গল আলেয়া।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বীরেশ্বর। সত্যটা প্রকট হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। চারদিকের হু হু করা অন্ধকারে মৃত্যু শ্বাস ফেলছে। বিষাক্ত সাপের অন্ত নেই এ সমস্ত জলায়, বুনো শূয়র আছে ঘাসবনে, আর—আর, অপদেবতা, অশরীরী!

পথ হারিয়েছে সে—দিক হারিয়েছে। সারাটা রাত এই মাঠের মধ্যে এমনি করে নির্দয় কৌতুকে আলেয়া হাতছানি দেবে তাকে—টেনে নিয়ে যাবে অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যে।

বাঁচতে চায়—একান্ত করে বাঁচতে চায় বীরেশ্বর। সে মরবে না, মরতে পারবে না। এমন করে নিজেকে সঁপে দিতে পারে না আলেয়ার রাক্ষসী-মায়ায়। সে শিকার করতে চায় না, ক্যাম্পে ফিরে যেতে চায়। লালশরে তার আর দরকার নেই।

বাঁচবার প্রচণ্ড প্রয়াসে ভেঙে-পড়া পা দুটোকে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে তুলে দাঁড়িয়ে গেল বীরেশ্বর। উদ্‌ভ্রান্ত আর্ত চোখে চারদিকের ক্ষমাহীন অন্ধকারের দিকে তাকাল একবার। তারপর আকাশে বন্দুকটা তুলে ট্রীগার টানল শেষ কার্তুজের ওপর।

ক্লান্ত হাত সামলাতে পারল না। একটা অস্বাভাবিক জোরে নেমে এল বন্দুকের কুঁদোটা—প্রবল বেগে ধাক্কা মারল কাঁধের ওপর। চোখের সামনে একরাশ হাউই যেন ফুলঝুরি ছড়িয়ে শাঁ শাঁ করে উড়ে গেল আকাশে। অতিকায় একটা কালো পাহাড়ের মতো একরাশ নিকষ অন্ধকার ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বীরেশ্বরের বুকে।

চেতনা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়ার আগে সে শুনতে পেল মঞ্জু দত্ত হেসে উঠছে খিল্ খিল্ করে। কিন্তু না—লালশরের ডাক। ঘাসবনের মধ্যে মুখ-থুবড়ে পড়ে-থাকা বীরেশ্বরের দেহটাকে ঘিরে সারারাত নাচতে লাগল আলেয়া,—হাঁসের ডাক প্রহরের পর প্রহর ধরে প্রেত-অন্ধকারটাকে মুখর করে রাখল মঞ্জু দত্তের উচ্ছ্বসিত হাসির মতো।

পুরোনো

দোতলার বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল সুখময়। তার মক্কেলদের আসবার সময় হয়েছে। এরপর একে একে এসে তারা হাজির হবে। রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলবে ল-পয়েন্টের আলোচনা, কেসের ভবিষ্যৎ। যে মামলার নিশ্চিত পরাজয় চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তার সম্পর্কেও ভরসা দিয়ে বলতে হবে ঃ ভাববেন না– কিচ্ছু ভাববেন না। পাটনা হাইকোর্টের নজীর আছে—ওদের ও-সব অবজেকশন আইনে দাঁড়াবে না।

মাথার মধ্যে আইনের কতগুলো জটিল গোলকধাঁধা বয়ে সুখময় নেমে চলেছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বারান্দার ওপরে শীতলপাটি বিছিয়ে মা তার ছেলেমেয়েকে রূপকথা বলছেন।

সুখময়কে দেখেই ছেলেমেয়ে দুটো কুঁকড়ে গেল একেবারে। তারপর সুখময় কিছু বলবার আগেই রিন্‌রিনে গলায় টুনু বললে, আজ আমাদের কিন্তু বকতে পারবে না বাবা। মাস্টার মশাই আজ আসেন নি—আমরা ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনছি।

মা বললেন, হ্যাঁ বাপু, আমিই ওদের গল্প শোনাতে ডেকে এনেছি। তুই আর অমন করে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিসনে। নিজের কাজে যা।

সুখময় হাসল।

—আমি চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—কে বললে তোমাকে? তুমি যখন ছুটি দিয়েছ—তখন ওরা আমার আওতার বাইরে আজ। তা নয়, আমিও গল্প শুনব।

কী যে পাগলামি জাগল অ্যাডভোকেট সুখময়ের—বসে পড়ল শীতলপাটির এক কোণায়। টুনু আর বেণু সভয়ে ঠাকুরমার গায়ের কাছে সরে গেল।

—কী করছিস সুকু!—মা একটা ধমক দিলেন: যা দেখি নিচে। তোর মক্কেল আসবে এক্ষুনি।

সুখময় হাসল: আসে তো বসে থাকবে আরো কিছুক্ষণ। তোমার একটা গল্প না শুনে আমি নড়ব না।

মা বিপন্ন হয়ে বললেন, ছাখো তো কাণ্ড!

ছোট্ট বেণুর প্রতিবাদ এবার স্পষ্ট হয়েই বেজে উঠল: তুমি আমাদের গল্প শোনা নষ্ট করে দিচ্ছ বাবা। যাও না।

—যাও না! কেন যাব?—গভীর গম্ভীর অ্যাডভোকেট সুখময় তরল হয়ে বললে, আজ যে খুব জোর খাটানো হচ্ছে ঠাকুরমার ওপর! জানিস, ঠাকুরমা আমার মা? তোরা যে মা-র কোল থেকে আমাকে একেবারে ঠেলেই ফেলে দিতে চাইছিস। না, কিছুতেই যাব না আমি। অন্তত একটা গল্প শুনবই।

মা বিব্রত হয়ে চারদিকে তাকালেন: কী মুশ্‌কিল! তোরা যে ঝগড়া আরম্ভ করলি! আচ্ছা সুকু, এ-সব রূপকথার গল্প তুই কী শুনবি বল্‌তো? তোর তো অনেক বিলিতী গল্পের বই আছে, পড়তে হয়, সেগুলো পড়্‌গে।

—বিলিতী গল্প পড়বার সুযোগ বিস্তর পাওয়া যাবে মা, কিন্তু তোমার রূপকথা শোনবার সুযোগ বেশি আসবে না। বলে যাও।

—কিন্তু এ যে সবই পুরোনো।

—তা হোক না, নতুন করে শুনব।—সুখময় নাছোড়বান্দা।

টুনুর এবার ধৈর্যচ্যুতি হল।

—বাবা খালি দেরী করিয়ে দিচ্ছে। তুমি বলে যাওনা ঠাকুরমা।

মা আর একবার সুখময়ের দিকে তাকালেন: হ্যাঁরে, তুই যে সত্যিই বসলি দেখছি।

—বলেছি তো, গল্প না শুনে আমি নড়ব না। সুখময় বেশ নিশ্চিন্তভাবে বসল দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে।

—বাধা দিবি নে তো?

—একদম না।

—হেসে ফেলবি না?

সুখময় আহত হয়ে বললে, তুমি কি ভাবছ মা, অ্যাডভোকেট হয়েছি বলেই আমি একটা গাধা হয়ে গেছি?

বেণু ছোট্ট একটা ধাক্কা দিলে ঠাকুরমাকে: বলো না!

—বলছি - বলছি রে বাপু।—মা একবার লজ্জিত চোখে সুখময়ের দিকে তাকালেন: কোন্‌টা?

—সেই যে শুরু করেছিলে? সেই রূপমালার গল্প।—টুনু মনে করিয়ে দিলে। মা একটু কুণ্ঠিতভাবেই আবার বলতে আরম্ভ করলেন রূপমালার কাহিনী।

বাড়ি লেকের সামনেই। দোতলার বারান্দা থেকেই দেখা যাচ্ছে লেকের আঁকাবাঁকা জলে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। রাস্তার ওপারে দুটো নারকেল গাছ—তাদের চিরুন চিরুন পাতার ছায়া বারান্দায় এসে কাঁপছে। পাশের বাড়ির ডক্টর সেনগুপ্তের ছোট মেয়ে সেতার বাজাচ্ছে—বেশ মিষ্টি হাত—ইণ্টার কলেজিয়েট কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। দ্রুত ঝালা তুলছে এখন: ডাবা-ডারা-ডারা-ডাবা। আওয়াজটা খুব জোরাল হয়ে আসছে না, একটা চমৎকার মৃদু নেপথ্য-সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে।

স্বপ্নভরা চোখ মেলে শুনতে লাগল সুখময়।

সেই রূপমালা। আজ ত্রিশ বছর আগে তার গল্প শুনেছে সুখময়। এই ত্রিশ বছরে কত বদলে গেছে সে—মাথার চুলে পাক ধরেছে, বয়সের অভিজ্ঞতা মনকে সন্দিগ্ধ আর সংকীর্ণ করে তুলেছে। এখন আর কোনো অবস্থাতে সে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয় না, তার ধীর স্থির বিচারক মনকে সহজে কিছুতেই নাড়া দিতে পারে না। একেবারে বদলে গেছে সুখময়। বুড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে—ফুরিয়েও যাবে তারপর।

মা-র চুল তো অর্ধেক সাদা। কপালের সেই বড় সিঁদুরটা কবে মুছে গেছে, সেই চওড়া লালপাড় শাড়ীই বা কোথায় গেল? গোল গাল হাত দুখানি থেকে কবে অদৃশ্য হয়েছে গোছাভরা সোনার চুড়ি—দুধের মতো সাদা শঙ্খবলয়। এখন মা-র কপালটা একটুক্রো মার্বেল পাথরের মতো শুভ্র, পরনে সাদা থান, নিরাভরণ হাত দু-খানিতে নীল শিরা ফুটে বেরিয়েছে। মা-ও বদলে গেছেন।

কেবল বদলায়নি এই রূপমালা—অনন্ত-যৌবনা রূপকথার এই মেয়েটি। ত্রিশ বছর আগে যেমন সে একদিন ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় গা ধুতে এসেছিল নীল নিতল পদ্মসায়রের জলে, আজো সে তেমনি করেই আসে। আজো ফুলে ফুলে ছাওয়া ছাতিম গাছটায় একটা বৌ-কথা কও একটানা ডাকতে থাকে, পদ্মসায়রের ঘাটলার পাশে শ্যাওলার ভেতরে যে দুটো রাজহাঁস ডানার ভেতরে ঠোঁট মুড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, রূপমালার কাঁকনের ঝঙ্কার শুনে চমকে জেগে ওঠে তারা। হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাওয়া আকাশ থেকে দুটি নীল তারা লাল তারা দুখণ্ড মানিকের মতো নেমে আসে পৃথিবীর দিকে। বিদ্যুতের মতো একটা ধারালো আলোর ঝলকে রাজহাঁস দুটোর ধাঁধা লাগে, অবাক হয়ে রূপমালা দেখে, লাল-নীল দুটি খোকা খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে পদ্মসায়রের জলে ডুবে যাচ্ছে।

রূপমালা ডাক দিয়ে বলে, কারা তোমরা? কোন্ আকাশের তোমরা মানিকের ফুল? পদ্মসায়রের জলে একটা ছোট্ট ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ দুলতে দুলতে আসে রূপমালার পায়ের কাছে। ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পড়ে ঘাটলার ওপরে। সেই জলের শব্দে রূপ-মালা শুনতে পায়, কারা যেন বলছে—

ত্রিশ বছর আগে রূপমালা যেমন শুনত, আজও তেমনি শোনে। তারপর পদ্মসায়রের নীল নিতলে সেই প্রবালপুরী। সেই শ্যাওলা-জটা ডাকিনীর আশ্চর্য কুহক। বিশ্রী একটা কালো পানকৌড়ি সেজে পদ্মসায়রের গেঁড়োগুগ্‌লির মধ্যে সে পলাতক রাজপুত্রদের সন্ধান করে ফেরে এই ত্রিশ বছর পরেও। সব ঠিক আছে—শুধু সুখময়ই

সরে গেছে রূপ-কল্পনার সে স্বপ্ন-জগৎ থেকে। রাজকন্যা রূপমালা আজ আর তার কেউ নয়।

সুখময়ের মনে পড়ে: তাদের বাড়ির ছাদ থেকে কীর্তনখোলা নদীর জল দেখা যেত, এমনি জ্যোৎস্নার ঢেউ দুলত তার ওপর। বাড়ির সামনে নারকেল-সুপুরীর পাতা নদীর বাতাসে কাঁপত—চিকণ পাতার ছায়া-আল্পনা দুলে দুলে যেত মায়ের শান্ত-কালো চোখের ওপর। কীর্তনখোলাকে মনে হত সেই পদ্মসায়র—হঠাৎ একটা শ্বেত পাথরের ঘাটলায় যেন একটু একটু করে রূপ নিত রূপমালা—মাও যেন তারই মতো স্বপ্ন দেখতে দেখতে বলে যেতেন—সেই পুরোনো, তাঁরও মায়ের কাছে শোনা, কতকালের পুরোনো গল্প।

মা'র কাহিনী আরো অনেকক্ষণ চলত, আরো অনেকক্ষণ ধরে আবিষ্ট মন নিয়ে বসে থাকত সুখময়। কিন্তু সুর কেটে গেল। হঠাৎ সুখময় আবিষ্কার করল, পাশের বাড়িতে ডক্টর সেনগুপ্তের ছোট মেয়ের সেতারটা কখন থেমে গেছে।

আর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী প্রতিমা।

প্রতিমা কোন্ এক বাল্যসখীর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিল। ঝাঁকাল শাড়ী আর সুগন্ধির জৌলুস ছড়িয়ে হাতের লাল ভেল্‌ভেটের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে এইমাত্র।

প্রতিমা বললে, উঃ—বড্ড খাইয়েছে আজ। ফ্রায়েডর মিষ্টি থেকে শুরু করে—একি! ছেলেমেয়ে দুটো এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে যে!

ঘোর ভেঙে তাকাল সুখময়।

মা অপ্রতিভ হলেন: তাই তো, গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে গেছে। আমি ওদের নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি।

প্রতিমা বললে, আপনি কষ্ট করবেন কেন? চাকর-বাকরগুলো সব মরেছে নাকি?—গলা তুলে ডাকল: হরিয়া—হরিয়া—

সুখময় তখনো বসেছিল দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। স্বপ্ন মিলিয়ে

গেছে। চেনা, বাস্তব সংসার। রাজকন্যা রূপমালা মুহূর্তের জন্যে পৃথিবীতে ধরা দিয়েছিল, চাঁদের আলোর সিঁড়ি বেয়ে এতক্ষণে আবার পৌঁছে গেছে ছায়াপথের দেশে। অকারণেই একটা নিঃশ্বাস পড়ল সুখময়ের।

প্রতিমা যেন এতক্ষণে দেখতে পেল তাকে।

—ওকি! তুমি আবার বসে আছো কেন এখানে?

সুখময় উঠে দাঁড়াল: মা-র কাছে বসে রূপকথা শুনছিলাম।

—রূপকথা শুনছিলে? —প্রতিমা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল: হয়েছে কী তোমার? বয়েস যত বাড়ছে, ততই ছেলেমানুষ হচ্ছ নাকি?

—হতে পারলে মন্দ হত না—সুখময় একটা হাই তুলল।

—বেশ তো, কাল একটা রূপোর ঝিনুক-বাটি কিনে দেব, মা আবার কোলে করে দুধ খাওয়াবেন। আবার চোখ বড় বড় করে শুনবে পুরোনো রূপকথা: এক ঝলক হেসে উঠেই গম্ভীর হল প্রতিমা: সত্যি—কী পাগ্‌লামি হচ্ছে বলো তো? আসবার সময় দেখে এলাম সাত আটজন লোক বসে রয়েছে নিচের ঘরে। আর তুমি এখানে—

—এখনি যাচ্ছি—সুখময় সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সত্যিই বদলে গেছে সব। ছেলেবেলার সেই দিনগুলো থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে সে, পুরোনো মায়ের কাছে পুরোনো হয়ে আর ফিরে যাওয়া যাবে না!

ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল সুখময়। সেই মক্কেল, সেই কেস, সেই ল-পয়েন্ট্‌স্‌, সেই এলাহাবাদ আর পাটনা হাই-কোর্টের রেফারেন্স্‌। মা-র কাছে ফিরে যাওয়ার সময় কই আর?

নামতে নামতে সে শুনতে পেল, তীক্ষ্ণ গলায় প্রতিমা ধমক দিচ্ছে হরিয়াকে।

—আমি একদণ্ড বাড়িতে না থাকলেই সব স্বরাজ্য পেয়ে যাস, তাই না? বাচ্চাদুটো মাটিতে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে—তুলে

নিয়ে শুইয়েও দিতে পারিস নি! তোদের নিয়ে আমার আর চলবে না, এবার একে একে সবগুলোকে বিদেয় করব বাড়ি থেকে—

দুদিন পরে কোর্ট থেকে জ্বর নিয়ে ফিরল সুখময়।

অল্প অল্প জ্বর নিয়ে এসেছিল, রাত বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচার উঠতে লাগল ওপর দিকে। দুই-তিন-চার—

ডাক্তার এলেন। ইন্‌জেক্‌শনও দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, আইসব্যাগ ধরে রাখুন, ভাবনা নেই, একটু পরেই নেবে যাবে।

মা কয়েকবারই ঘুরে ফিরে এসেছিলেন ছেলের ঘরে। কিন্তু একটু পরেই বুঝলেন, এখানে তাঁর করবার কিছু নেই। বরং যেন একটু বিরক্তই হল প্রতিমা।

—আপনি কেন মিথ্যে ঘুরঘুর করছেন মা? বুড়ো মানুষ— রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন। আমি তো আছিই।

মা ফিরে এলেন নিজের ঘরে। প্রকাণ্ড বিছানার দু' পাশে দু'টি নাতি-নাত্‌নী অঘোরে ঘুমুচ্ছে, মাঝখানে তাঁর জায়গা। শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ঘুম এল না। বেণুর মাথা থেকে বার বার বালিশ সরে যাচ্ছে, সেটা ঠিক করে দিতে হল। টুনুর টুকটুকে গালের ওপর ছোট্ট একটা লাল দাগ ফুটে উঠেছে—ঈশ্‌, মশায় কামড়েছে নাকি? মা মশারির ভেতরে অপরাধী মশাটার সন্ধান করতে লাগলেন।

কিন্তু ঘুম আসছে না—ঘুম আসবে না—সত্যিই তো, ও ঘরে তাঁর কোনো কাজই নেই আর। প্রতিমাই এখন যথেষ্ট। অনেক বড় হয়েছে সুখময়—অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে তাঁকে। এখন আর তাঁর কিছুই করবার নেই।

নিজের মনেই এলোমেলো কত কী ভেবে চলেছিলেন, হঠাৎ ঘরের ভেতরে প্রতিমা এসে দাঁড়াল। চঞ্চল ভীত গলায় ডাকল: মা!

—কী হয়েছে বৌমা ?

—উনি কেমন ছটফট করছেন, আমার ভালো লাগছে না। আপনি আসুন একবার।

প্রতিমা কথা শেষ করার আগেই মা নেমে পড়েছেন খাট থেকে। শান্ত-মৃদু গলায় বললেন, ফোন করেছিলে ডাক্তারকে ?

—করেছিলাম। বললেন, ভয়ের কিছু নেই। ইন্‌জেক্‌শনটা ধরলেই টেম্পারেচার নেমে আসবে।—প্রতিমার স্বর আর্ত হয়ে উঠল : আমার একদম ভালো লাগছে না।

—ব্যস্ত হয়ো না, আমি দেখছি।

মা ছেলের ঘরে এলেন। জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্ করছে সুখময়। উদ্‌ভ্রান্ত চোখদুটো টকটকে লাল।

মা একবার তাকিয়ে দেখলেন সেদিকে। তেম্‌নি শান্ত স্বরে বললেন, ওর এ জ্বর আমি চিনি। তুমি ভয় পেয়ো না বৌমা, ওই ডেক-চেয়ারটায় একটু স্থির হয়ে বোসো। আমি দেখছি।

সুখময়ের শিয়রে বসলেন মা। আইস্‌ব্যাগটা তুলে নিয়ে মাথায় ধরলেন।

অচৈতন্য জ্বরের মধ্যেও কী করে সুখময় টের পেল কে জানে। আর্তস্বরে বললে, মা !

মা সস্নেহে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এই যে বাবা—আমি !

ডেক-চেয়ারে বসে অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রতিমা। যখন চমকে জেগে উঠল, তখন ঘরের আলোটা ম্লান হয়ে আসছে—বাইরে থেকে আসছে ভোরের আভা।

ক্ষিপ্র পায়ে উঠে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল প্রতিমা। তার হাত রাখল সুখময়ের গায়ে।

জ্বর রেমিশন হয়ে গেছে। মায়ের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে

ঘুমুচ্ছে সুখময়, একখানা হাত দিয়ে মায়ের কোমর জড়িয়ে রেখেছে শিশুর মতো—যেন তার ঘুমের ঘোরে মা উঠে পালিয়ে না যান। মা ঘুমন্ত, খাটের পিছনে হেলান দিয়ে কখন এলিয়ে গেছেন গভীর ঘুমে, একটুকরো তৃপ্তির হাসি জড়িয়ে আছে তাঁর ঠোঁটের কোণায়। পুরোনো মায়ের কোলে পুরোনো রূপকথা শুনতে শুনতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে আট বছরের ছেলেটি।

প্রতিমা তাঁদের ঘুম ভাঙাল না। অনধিকারীর সংকোচ নিয়ে পা টিপে টিপে সরে এল খাটের পাশ থেকে।

দক্ষিণান্ত

গাড়ির ভেতর অন্ধকার দুলছে। একটা বিরাট কালো পেণ্ডুলাম যেন। সকালবেলা মোগলসরাইয়ের আগে স্টপেজ নেই আর। চাকায় চাকায় বেড়ে-চলা স্পীডের অস্থিরতা। কত মাইল জোরে ছুটতে পারে এই ক্যানাডীয়ান এঞ্জিনগুলো? পঞ্চাশ—ষাট্—সত্তর?

গাড়ী—অন্ধকার—সময়। এক সঙ্গে ছুটে চলেছে। মোগল-সরাইয়ে পৌঁছুবার আগে অনেকগুলো নক্ষত্র ঝরে যাবে। আর অনেক মাইল। আর এলোমেলো সহস্র স্বপ্নের ভিড় ঠেলে চেতনার সীমান্তে এসে চোখ মেলে তাকাবে উর্মিলা। কিন্তু তার আগেই সাপের জিভের মতো ধারালো টর্চের আলো এসে পড়ল উর্মিলার চোখে।

উর্মিলা জাগল না। তরল ঘুমের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির মতো হয়তো মনে হল: যেমন হয়;—পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোনো স্টেশনের ইলেক্‌ট্রিকের আলোই বুঝি কাচের জানলা দিয়ে। ঘুমের মধ্যে আচমকা খানিক তপ্ত রোদের স্বপ্নই দেখল হয়তো বা।

কিন্তু টর্চ যে জ্বেলেছিল সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে। সেই যে কেঁপে উঠেই টর্চটা নিভে গিয়েছিল, তারপরে তার অবশ আঙুল আর টর্চের বোতামটাকে খুঁজে পেল না। চলন্ত গাড়ির বেপথু অন্ধকারে আশ্চর্য দৃঢ়তায় সে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। একটা পাহাড়ী নদীর স্রোতের উল্‌টো মুখে প্রাণপণে জল ঠেলে যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—ঠিক সেইরকম।

গাড়ি। অন্ধকার। সময়। সব একসঙ্গে ছুটে চলেছে।

বাইরে নয়, তার মনের মধ্যেই। এইবারে তার দুটো পা বেয়ে বেয়ে একটা তীক্ষ্ণ হিমার্ততা উঠে আসতে লাগল ওপর দিকে। একবারের জন্যে মনে হল, যে পথ দিয়ে সে এসেছে, সেই দিয়েই সে ছিটকে চলে যায় বাইরে। কিন্তু হাতের কাছে হঠাৎ কখনো এক শিশি প্রাণঘাতী বিষ পেলে যেমন অকারণে, অর্থহীন কৌতূহলে সেটাকে পরখ করে দেখতে ইচ্ছে করে—তেমনি একটা বিষাক্ত মাদকতায় সে অভিভূত হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর: তারপর সেই ঠাণ্ডা সর্পিল অনুভূতিটা যখন তার বুকের কাছে উঠে আসতে লাগল, যখন একটা নিষ্ঠুর বরফের মুঠি দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল তার হৃৎপিণ্ড তখন—

তখন আর থাকতে পারল না। দু পা পেছনে সরে এসে খুট্ করে সুইচ্‌টা টেনে দিল সে।

উজ্জ্বল খরধার আলোয় ভরে গেল কামরা। একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ তুলে অন্ধকারটা যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চাকার তলায়।

আর সচকিতে উঠে বসল উর্মিলা। সন্ত্রস্তভাবে পায়ের দিকে টেনে দিল শাড়ীটা। চোখের সামনে বিভীষিকার মতো ফুটে উঠল একা গাড়িতে আর একটি অপরিচিত মানুষ। মুখের ওপর নিচু করে নামানো কালো একটা ফেল্‌ট হ্যাটের ছায়া পড়েছে। ছাইরঙা ট্রাউজারের পকেটে একটা হাত পুরে দিয়ে, আর একটা হাত সুইচের ওপর রেখে প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

আর্তস্বরে প্রাণান্তিক একটা চিৎকার করে উঠল উর্মিলা—হাত বাড়াতে গেল মাথার কাছে অ্যালার্ম সিগ্‌ন্যালের দিকে। সেই মুহূর্তেই ধীরাজ ডাকল, উর্মিলা!

চমকে উঠেই নিঃসাড় হাতখানা খসে পড়ল উর্মিলার পাশে। কাঠের পুতুলের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সে। ততক্ষণে মাথা থেকে ফেল্‌ট হ্যাটটা সরিয়েছে ধীরাজ। সেই লাল্‌চে রঙের কোঁকড়ানো চুল, একটা মোটর দুর্ঘটনার স্মারক ডান চোখের ওপরের

সেই কাটা দাগটা। চার বছর পরে হলেও ভুল হওয়ার কারণ নেই বিন্দুমাত্র।

—তুমি!

নিঃশব্দে হাসল ধীরাজ। আর একটা নির্ভুল প্রমাণ হিসেবে ঝিলিক দিয়ে উঠল বাঁধানো দাঁতের দুটো রূপালি ক্লিপ।

—দেখাটা খুব নাটকীয়ভাবে হল, তাই না?—মুখের ওপরে হাসিটা জাগিয়ে রেখেই এগিয়ে এল ধীরাজ—বসে পড়ল উর্মিলার কাছে। একেবারে গা ঘেঁষে বসল না—একটা সৌজন্য-সঙ্গত দূরত্ব বজায় রাখল মাঝখানে। আবার স্তব্ধতা। ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মনে অজস্র কথা কল্লোলিত হয়ে ওঠার স্তব্ধতা। বিস্ময়ের ঝড়টা ভেঙে পড়বার আগে থমথমে কঠিন স্তব্ধতা।

—তুমি—তুমি!—এবার গোঙানির মতো মনে হল উর্মিলার গলা।

নিজের কথাগুলোকে নিয়ে আলতোভাবে খেলা করবার ভঙ্গিতে ধীরাজ বললে, অনেক দিন পরে দেখা হল উর্মি। বড় ভালো লাগছে তোমাকে। একটু মোটা হয়েছ—আরো সুন্দর হয়েছ দেখতে।

আস্তে আস্তে বিহ্বলতার ছায়াটা সরে যেতে লাগল উর্মিলার মুখ থেকে। তার জায়গায় কয়েকটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠতে লাগল।

—আমার সুন্দর হওয়া না হওয়ায় কী আসে যায়?—মৃদু কণ্ঠে উর্মিলা বললে, আমি তো তোমায় বাঁধতে পারিনি। আজ এ গাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ থাকলেই তুমি খুশী হতে।

হঠাৎ হা-হা করে একটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ধীরাজ।

—তুমি কি মনে করো উর্মি—এই যোগাযোগটা নেহাত কাকতালীয়? মোটেই না। গয়া স্টেশনে ট্রেনে উঠতে গিয়েই এই কামরায় তোমায় দেখতে পেলাম। কী করব ভাবতে ভাবতে গাড়িটা দিলে ছেড়ে। খানিকক্ষণ ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থেকে দরজার হাতল ঘোরালাম। লক্ করা ছিল না—চলে এলাম ভেতরে।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না ঊর্মিলা। প্রশ্ন করল না, জানলার সূক্ষ্ম জালের ভেতর দিয়ে কী উপায়ে অন্ধকার কামরায় তাকে দেখতে পেল ধীরাজ। বলতে চাইল না, ঘুমোনোর আগে নিজের হাতেই সে শক্ত করে লক্ করেছিল দরজাটা।

—এ ভারী অন্যায় ঊর্মি—ধীরাজের গলায় অনুযোগের রেশ: এত বড় একটা লেডীজ কম্পার্টমেণ্টে তুমি একা। দরজা লক্ না করে ঘুমোতে আছে এভাবে? পথেঘাটে কতরকম বিপদ ঘটে আজকাল।

—তুমি আসবে বলেই দরজা খুলে রেখেছিলাম।

—আমাকে ঠাট্টা করছ ঊর্মি?—ধীরাজ ব্যথিত হল: অবশ্য সে দাবি তোমার আছে। তোমার সম্পর্কে যে অন্যায় আমার হয়েছে তার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি না। তা হলেও এরকম অসাবধান হয়ে চলাফেরা করাটা—

কিছুক্ষণ ধীরাজের মুখের দিকে অদ্ভুত বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ঊর্মিলা। তারপর:

—পৃথিবীতে সব বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করার ভার ছিল তোমারই। সে ভার তুমি যখন বইতে চাও না, তখন কোনো বিপদকেই আমার ঠেকাবার সাধ্য নেই। চারদিকের দেওয়াল যার ভাঙা—একটা দরজা লক্ করা না করায় তার কতটুকু আসে যায়?

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল ধীরাজ। মলিন জুতোটা ঠুকতে লাগল মেজের ওপর।

—তোমার কাছে ক্ষমা চাইব না ঊর্মি। সে জোর নেই। কিন্তু তোমারও তো উপায় ছিল।

—কী উপায়?

—হিন্দুমতে বিয়ে করে তোমাকে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনে জড়াইনি আমি। সিভিল ম্যারেজ হয়েছিল আমাদের। আদালতে একটা দরখাস্ত করে দিলেই তুমি মুক্তি পেতে আমার কাছ থেকে।

মুক্তি! এতক্ষণে হাসল ঊর্মিলা। মৃদুরেখ—নীরক্ত।

—দূরে থাকলেও আমি তোমার খবর নিয়েছি বরাবর। আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি কেন তুমি এখনো উর্মিলা মুখার্জি থেকে আমার অপরাধকে বয়ে চলেছ। কেন তুমি ফিরে যাওনি কুমারী উর্মিলা মল্লিকের মর্যাদায়? —একটা অনুতপ্ত জিজ্ঞাসায় এসে থমকে গেল ধীরাজ।

জানালার জালের ওপর চোখ রেখে বাইরের তরঙ্গিত অন্ধকারে কী দেখতে চাইল, উর্মিলাই জানে। স্বগতোক্তির মতো বললে, পদবী বদলালেই কি সব বদলায় বলে তোমার ধারণা?

—মন?—নিজের অজ্ঞাতেই ধীরাজ উচ্চারণ করল শব্দটা।

উর্মিলা আবার ধীরাজের দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি—বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল তা থেকে।

—তুমি তার অস্তিত্ব মানো কিনা জানি না। কিন্তু ওটা অনেকের থাকে।

—তা হলে—ধীরাজ প্রায় গোঙিয়ে উঠল এবার: তা হলে আজও তুমি আমাকে ভালোবাসো উর্মিলা?

উর্মিলা জবাব দিল না।

প্রায় আর্তস্বরে ধীরাজ বলল, কিন্তু এর তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমাকে মনে রাখবার মতো কিছুই তোমাকে আমি দিয়ে আসিনি। বিয়ের একমাস না কাটতেই যখন আমার চোখের নেশাও কাটল, তারপর দেড় বছরের বিবাহিত জীবনে একটি দিনও তোমার সুখের স্মৃতি নয়! বাবার চেক বইয়ের পাতা জাল করে টাকা চুরি করেছি- স্বীকারোক্তির স্বর্গীয় অনুতাপে উদ্বুদ্ধ গলাটাও একবারের জন্যে ধরে এল ধীরাজের: বন্ধুর স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি—

—থাক—থাক।—যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে ধীরাজকে থামিয়ে দিলে উর্মিলা: থাক ওসব।

ধীরাজ চুপ করল। তাই বটে। এসব কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই আর স্বীকারোক্তিটা আত্মপ্রসাদের রূপ নিচ্ছে যেন। অপরাধের তালিকা পেশ করতে গিয়ে যেন নিজের গৌরব

প্রচার করছে সে। নতুন করে অস্ত্রোপচার করছে ঊর্মিলার শুকিয়ে আসা ক্ষতের ওপরে।

—কিন্তু এরকম বিয়ে তো অনেকেই নাকচ করে ঊর্মি।—ধীরাজ আবার সূত্র ধরল সন্তর্পণে।

—সবাই করে না—অল্প অল্প কাঁপতে লাগল ঊর্মিলার ঠোঁট। হঠাৎ হাতের পিঠে সে চোখের থেকে আড়াল করে ধরলে আলোটা। বড্ড বেশি জোরাল—বড্ড বেশি জ্বালা করছে চোখে। ঝরঝরিয়ে জল নেমে আসবে কিনা কে জানে।

—প্রেম অনেকের জীবনে ঋতুতে ঋতুতে আসে—বারে বারে ফুল ফোটায়।—চোখের জলটাকে কিছুতেই ঝরতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞায়, ঠোঁটে একটা প্রাণপণ চাপ দিয়ে ঊর্মিলা শেষ করল: কেউ-কেউ দেউলে হয়ে যায় একবারেই।

অনুভূতি-কল্লোলিত স্তব্ধতায় আবার নীরব হয়ে বসে রইল দু'জন। গাড়ির চাকায় ছিটকে সরে যেতে লাগল দেশকাল—দু' একটি তারা ঝরে যেতে লাগল কৃষ্ণপক্ষের কালো আকাশে। একটা ব্রীজ গুম্ গুম্ করে গুমরে চলল পায়ের নিচে। শোণ? তাই হবে হয়তো।

কী করা উচিত এর পরে? ধীরাজ ভাবতে লাগল। রক্তের মধ্যে একটা উদ্বেলিত আবেগ ঠেলে উঠতে চাইছে। কতদিন পরে আজ সে নতুন করে দেখল ঊর্মিলার মুখ! পাঁচ বছর আগেকার একরাশ নীল বিকেল, রোমাঞ্চিত সন্ধ্যা, কথা বলা না-বলা রাত্রি— সব এক সঙ্গে দীপিত হয়ে উঠল ঊর্মিলার মুখে।

এখনি একটা আশ্চর্য মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে ধীরাজ। আবার পুরোনো দিনগুলোর মতো ঊর্মিলাকে বুকে টেনে নিতে পারে—ক্ষমা চাইতে পারে, বলতে পারে: সব শোধবোধ হয়ে গেছে। এসো, আবার শুরু করা যাক নতুন পালা। ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। অনেক অন্ধকার পার হয়েছি—হাতড়ে ফিরেছি অনেক চোরাগলির আনাচে কানাচে। দেখেছি, দাঁড়াবার জায়গা কোথাও নেই—কোথাও নেই

আশ্বাসের একান্ত আশ্রয়। আজ আবার তুমি নতুন করে আমার হাত ধরো উর্মিলা! মুক্ত করো আমাকে—আমাকে উত্তীর্ণ করো—

কিন্তু সে সাহস কোথায় ধীরাজের? তিন বছরের বিচ্ছেদ যে প্রেমকে জাগিয়ে রেখেছে, একটা মুহূর্তের ছোঁয়া তাকে ঘৃণার মধ্যে রূপান্তরিত করে দেবে হয়তো। না—সাহস নেই আর।

আকস্মিকভাবে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল উর্মিলা। যেন মুক্তি পেতে চাইল অসহ্য স্নায়বিক পীড়ন থেকে।

—চা খাবে একটু?

—চা!—ধীরাজ নড়ে বসল।

—আছে আমার ফ্লাস্কে। হয়ে যাবে দু'জনের।

—দাও।—অন্য প্রসঙ্গে সরে যেতে পেরে ধীরাজও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভালো হল—এই-ই ভালো হল। পুরোনো দিনগুলো জীর্ণ হয়ে যাক কবরের ভেতরে। তার ওপরে মাথা তুলুক এলোমেলো আগাছার সারি। কোনো একদিন পরিচয় ছিল—আজ দেখা হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। যেটুকু ধীরাজের পক্ষ থেকে বলার একটা নৈতিক কর্তব্য ছিল, তা বলা হয়ে গেছে; উত্তরে যা বলার ছিল, তাও বলেছে উর্মিলা। এর পরে চা খাওয়া যাক সহজভাবে। সকাল বেলায় যখন মোগলসরাইতে ট্রেন পৌঁছুবে, তখন বিদায়-সম্ভাষণ জানানো যাবে সৌজন্য-সঙ্গত স্মিত-হাসিতে; হয়তো এমনও বলা যাবেঃ দু'জনে এক সঙ্গে কিছুটা সময় নেহাত মন্দ কাটল না। কী বলো?

বার্থের তলা থেকে ফ্লাস্কটা টেনে আনল উর্মিলা। একটা বেতের ঝুড়ি থেকে বের করলে চায়ের পেয়ালা আর প্লাস্টিকের গ্লাস। ছুটন্ত ট্রেনের দোলার ভেতরে যথাসম্ভব চা ঢালল গ্লাসে আর পেয়ালায়। তারপর পেয়ালাটা ধীরাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, কিছু খাবে?

—না, থাক।

—থাকবে কেন?—কোমল গলায় উর্মিলা বললে, অনেক খাবার আছে টিফিন ক্যারিয়ারে।

—না, না—এই অসময়ে কিছু খেতে পারব না।

চায়ের গ্লাসটা তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় উঠে বসল উর্মিলা। হাসল একটু। এতক্ষণ পরে তার হাসিটা স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

—ভুলে গেছ সব? ট্রেনে উঠলেই তোমার খিদে পেত। দিন হোক, রাত হোক—যে স্টেশনে যা পেতে তাই কিনে খাওয়ার অভ্যেস ছিল তোমার। পুরী মিঠাই গরম দুধ থেকে চীনেবাদাম পর্যন্ত।

কথাটা বলেই আবার বিবর্ণ হয়ে গেল উর্মিলা। ঘুরে ফিরে সমস্ত আলোচনা আবার সেই ব্যথার জায়গাটায় এসে কেন্দ্রিত হচ্ছে। মুহূর্তে সেটা লক্ষ্য করলে ধীরাজ। গুমোট মেঘটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে হেসে উঠল হা-হা করে।

—বাস্তবিক, কী পেটুকই যে ছিলাম! কিন্তু এখন ওসব বদ্ অভ্যেস ছেড়ে গেছে উর্মি। বয়স বাড়ছে তো! অসময়ে খেলে আজকাল আর সহ্য হয় না।

বয়েস বাড়ছে! তা বটে। সেই আশাতেই তো দিন কাটাচ্ছে উর্মিলাও। আরো কয়েক বছর পার হয়ে যাবে। পাক ধরবে মাথার চুলে, আজকের বেদনা নুন-ঝালের স্বাদের মতো অবসরিক রোমন্থনে পরিণত হয়ে যাবে। সেদিন উর্মিলার মনে হবে না—কী হতে পারত, কী হয়ে গেছে সে! সেদিন নিশ্চিত হয়ে ভাবা যাবে —যা হওয়ার তা হয়েই গেছে, এখন শান্ত নির্লিপ্তিতে নিজেকে ভাঁটার মুখে ভাসিয়ে দেওয়ার পালা।

তাই হোক। বয়স বাড়ুক উর্মিলারও। সেই নির্লিপ্তির নিরা-সক্তিতে সেও সমাহিত হোক।

—কোথায় চলেছ তুমি?—উর্মিলাই প্রশ্ন করল।

জবাব দেবার আগে নিজেকে একবার সামলে নিলে ধীরাজ। তারপর বললে, মোগলসরাই।

—ওখানেই থাকো?—জিজ্ঞাসাটা অর্থহীন জেনেও উর্মিলা রোধ করতে পারল না।

—গয়াতে থাকি। ডেরী-অন্‌-শোণ, মীর্জাপুরেও কখনো কখনো
—ধীরাজ হাসতে চাইল : সে যাক্‌, তুমি?

—কলকাতাতেই আছি। —চায়ের গ্লাসটা নামাল উর্মিলা, অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হল চা-টাকে : একটা কলেজে ডেমনস্ট্রেটারের চাকরি নিয়েছি।

—তবু ভালো। —চাপা উত্তেজনায় ঠোঁটের একটা কোণ বেঁকে এল ধীরাজের : আমার বাবার অন্ন তোমাকে মুখে দিতে হয় না। আমার অপরাধে সে অন্ন দিনের পর দিন বিষ হয়ে উঠত তোমার মুখে।

জানলার জালের মধ্যে দিয়ে উর্মিলা আবার তাকাল বাইরের দিকে। রাত্রির রঙ ধূসর হয়ে আসছে। আরো—আরো নক্ষত্র ঝরে গেছে। ঝরে গেছে আরো সময়।

—কোথায় চলেছ? ধীরাজই জের টানল।

—দেরাদুন। বাবা আজকাল ওখানেই বদলি হয়েছেন।

—এই গরমে দেরাদুন? —হৃদ্যতার আমেজ আনল ধীরাজ।

—কাছেই মুসৌরী।—অদ্ভুত দৃষ্টিতে ধীরাজের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল উর্মিলা : তা ছাড়া তুমি জানো, আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।

—মনে ছিল না।—ধীরাজ সপ্রতিভ হতে চাইল।

আবার নীরবতা। আবেগচঞ্চল নয়, কথামুখর নয়। সব কথা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার—সব অনুভূতি নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার নীরবতা। বিস্ময়, অনুতাপ, আবেগের পালা শেষ হয়ে গেছে। চা খাওয়া, দুটো একটা ভদ্রতাসুলভ বাক্য-বিনিময়—তাও ফুরিয়ে গেল। তারপর?

আর থাকা যায় না—আর বসা যায় না উর্মিলার কাছে। এইবার পালানো দরকার—যেমন করে এসে উঠেছিল এই গাড়িতে, তেমনি করে বিনা নোটিশে আবার নিজস্ব কক্ষপথে ছিট্‌কে পড়া। এই ট্রেন যখন দেরাদুনে পৌঁছুবে, তখন এই রাত্রিটাকে উর্মিলার অতীত দিনগুলির মধ্যে বিলীন করে দেওয়া দরকার।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল ধীরাজ। ট্রেনটা পাংচুয়াল। আর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে মোগলসরাই। টুকরো টুকরো কথা

দিয়ে নৈঃশব্দ্যকে জুড়তে জুড়তে কী করে পার হয়ে গেল এই দীর্ঘ সময়টা।

এবারে মরিয়া হয়ে ধীরাজ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ভালো আছো তো?

—হাঁ, ভালোই আছি।—উর্মিলার জবাব। একটা লোহার প্রাচীর পড়ল এইবার। দশ মিনিট ধরে অসহ্য অস্বস্তিতে একটার পর একটা মুহূর্ত গণে যেতে হবে এরপরে। বুকের ওপর চেপে-ধরা একটা পাথরের মতো এই নীরবতা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আনবে। মোগলসরাই পৌঁছুবার আগেই বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি ধীরাজ?

না, একটা উপায় আছে এখনো। পকেট থেকে আধ-পোড়া একটা চুরুট বের করে আনলে সে। তারের জালটায় চোখ রেখে দুর্ভেদ্য তন্ময়তার আড়ালে হারিয়ে রইল উর্মিলা।

স্টেশন মোগলসরাই। আরক্ত সকাল। কুলি আর যাত্রীর কোলাহল।

এই স্টেশনে নিশ্চয় নতুন যাত্রী উঠবে কামরায়। যদি নাও ওঠে —একটা সুদীর্ঘ দিন পড়ে রইল সামনে! অন্তত ধীরাজ আর ফিরে আসবে না। ফিরে আসবে না আর-একটা মর্মচ্ছেদী দুঃসহ রাত।

ট্রেনটা থেমে এল আস্তে আস্তে। তারের জালটা তুলে দিলে উর্মিলা। বাইরে থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে পড়ল ফ্যানের বাতাসে জ্বালা-ধরা উর্মিলার মুখে চোখে।

ধীরাজ উঠে দাঁড়াল। কালো ফেল্ট হ্যাট্‌টা পরে নিল মাথায়।

—আসি তবে।

—এসো।—অন্যমনস্ক জবাব এল উর্মিলার।

একবার কী ভাবল ধীরাজ—কী একটা বলতেও চাইল। আর কখনো বোধ হয় দেখা হবে না—এমনি কিছু হয়তো এগিয়েও এল ঠোঁটের কোণায়। কিন্তু কী হবে বলে? কী লাভ?

অবসাদ-জর্জর, আড়ষ্ট পায়ে ধীরাজ এগিয়ে গেল দরজার কাছে। নিরুদ্যম হাতে হাতলটা ঘোরাল।

চকিতের জন্যে মনে হল: কেমন হয় উর্মিলার সঙ্গে দেরাদুন পর্যন্ত চলে গেলে? আগের চাইতে আরো সুন্দর হয়েছে—আবার যেন সে নতুন করে আবিষ্কার করেছে তাকে। বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না। সব বদলে যেতে পারে, মন বদলে যেতে পারে, আবার ভালো লাগতে পারে উর্মিলাকে—

কিন্তু কী মানে হয় এসব পাগলামির? ধীরাজ নিজেকে সংযত করে নিলে। একটা আকস্মিক প্রেরণায় লাফিয়ে পড়ল নিচের প্ল্যাট্‌ফর্মে। তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে।

—শোনো?—

একটা তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক চিৎকারে ফিরে চাইল ধীরাজ। উর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার গোড়ায়! একটা অপরিচিত তীব্র দ্যুতিতে জ্বলছে উর্মিলার চোখ।

—আমাকে ডাকছ?—ধীরাজ থেমে দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে এল মন্ত্রবন্দীর মতো।

উর্মিলা অস্বাভাবিক গলায় বললে: টয়লেটের জানলা ভেঙে ঢুকেছিলে, পকেটে নিশ্চয় ছোরা কিংবা রিভলভার ছিল। আমার কাছ থেকেই বা পাওনাটা না নিয়ে ফিরে যাচ্ছ কেন?

বজ্রাহতের মতো কেঁপে উঠল ধীরাজ—একটা অব্যক্ত শব্দও করল হয়তো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উর্মিলার গলার হারছড়া এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। ধীরাজ ছুটে পালাবার আগেই তার দিকে ছুটে এল আর একজোড়া ভারী কঙ্কণ—একটা গিয়ে লাগল ডান চোখের কাটা দাগটার ওপরে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ধীরাজ—খানিকটা গরম রক্ত উছ্‌লে পড়ল চোখে।

দরজার পাশ থেকে তখন সরে গেছে উর্মিলা—এসে লুটিয়ে পড়েছে বার্থের ওপরে। এইবারে প্রাণভরে কাঁদতে পারছে উর্মিলা। এতক্ষণ পরে।

একটি অমর রাত্রি

দাঁড়ি মাঝিরা প্রত্যেকেই একে একে অতলান্ত কালো জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

কারণ, যে নৌকো বাঁচবে না, তার আশ্রয়ে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। কোন্ অসতর্কতার অবকাশে নৌকোর তলা থেকে কাঠের পাটাতন খসে গেছে, কেউ তা টেরও পায়নি। তারপর কালো রাতে মেঘনার এই নিকষ কালো জল পাড়ি দিতে গিয়ে সেই রন্ধ্র পথে সরীসৃপের মতো এসে ঢুকেছে মৃত্যু। একটু একটু করে ভরে উঠেছে খোল, কিছুক্ষণের মধ্যেই মাত্র কয়েকটা বুদ্বুদ ভাসিয়ে দিয়ে অতলের মধ্যে হারিয়ে যাবে। মেঘনার ঠিক বুকের মাঝখানে—তটরেখাহীন এই নিষ্ঠুর অন্ধকারে নৌকো বাঁচানোর চেষ্টা মিথ্যে পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং হাল-দাঁড় ছেড়ে মাঝিরা ঝুপঝুপ্ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেঘনার মাঝি—এই রাক্ষুসে নদীর সঙ্গে প্রতিদিন ওদের ঘরকন্না। জানে, যেমন করেই হোক কোথাও গিয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছুবেই—কোনো হোগলার চড়ায়, কোনো আরণ্যক তটভূমিতে।

শুধু একা যাত্রী মিত্র মশাই নৌকোর ছইয়ের ওপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নৌকো ডুবছে, একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে মেঘনার নিবিড় মৃত্যুর ভেতরে। ঝড় নেই, তুফান নেই,—টান নেই রাক্ষুসি ঘূর্ণির, তবু নৌকো ডুবছে। আর বড় জোর দশ মিনিট—মাত্র দশ মিনিট তাঁর জীবনের মেয়াদ। পশ্চিম বঙ্গের ছেলে। এমন ভয়ঙ্কর নদীর রূপ তিনি আর কখনো দেখেননি, কখনো তাঁর পরিচয়

হয়নি মৃত্যুর এমন বিচিত্র মূর্তির সঙ্গে। পূর্ববঙ্গে সরকারী চাকরি করতে এসে অনেক বারই তাঁকে মেঘনা, পদ্মা পাড়ি দিতে হয়েছে, ঝড়-তুফানের দোলায় নিজেকে নিরুপায়ভাবে সঁপেও দিয়েছেন অনেক বার। আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে আসা সেই ভয়ঙ্করের সঙ্গে নদীর ফেনিল উল্লাস মনের মধ্যে একটা প্রস্তুতি রচনা করে—যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে সেই সর্বনাশের ভেতর। কিন্তু এই রাত্রি! এই রাত্রিতে তো এমন করে মৃত্যুর আসবার প্রয়োজন ছিল না। নদীর কালো জল তরল সুরের মতো ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল দিকে দিকে —বাতাসের সজল নিশ্বাস ঘুমের ঘোর ঘনিয়ে আনছিল চোখের পাতার ওপর। আর নির্মল আকাশে নক্ষত্রের দ্যুতিসভা তাঁর কবিমনকে বিচিত্র কল্পনায় রোমাঞ্চিত করে আনছিল!

এই রাত্রেও মৃত্যু আসছে। আসছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত অবসরে, আসছে তাঁর ত্রিশ বছরের জীবনের ওপর। মাত্র ত্রিশ বছরে মরে যাওয়া! হিন্দুর ছেলে তিনি। ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের বৈরাগ্যবাণী আশৈশব গুঞ্জন করে ফিরেছে কানের কাছে। তবু, তবু! এই অন্ধকার নদীর পরেও আর একটা পৃথিবী ছিল। যেখানে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়ানো যায় পা দিয়ে, যেখানে ভোরের পাখির ডাক শুনে আশ্চর্য সুন্দর চোখ মেলে তাকায় ঘুমভাঙা তরুণী দিন, যেখানে প্রথম ফুলের গন্ধের উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে সুরের মতো গুনগুনিয়ে ওঠেঃ কী অপূর্ব এই পৃথিবী, কী অপূর্ব এই বেঁচে থাকার আনন্দ!

কিন্তু!

দূরে কাছে জল কাটবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে; আবছা অন্ধকারে তারার আলোয় তরল দীপ্তির ভেতর দু-একটা মাথাও যেন দেখা যাচ্ছে। তাঁরই মাঝিমাল্লার দল। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সাঁতার দিয়ে চলেছে। তিনি সাঁতার জানেন না. তাঁর কিছুই করবার নেই।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন এক জায়গায়। নৌকো ডুবছে—ডুবুক। তলিয়ে যাক তিলে তিলে। যা অনিবার্য তাকে মেনে নিতে আর দ্বিধা নেই কোথাও। প্রশান্তির একটা আশ্চর্য স্তরে এসে তিনি

পৌঁছেছেন। মাত্র ত্রিশ বছরেই তিনি ফুরিয়ে গেলেন। এই দুর্ঘটনার খবর যখন বহুদিন পরে কয়েকশো মাইল দূরে রাঢ়ের পল্লী চৌবেড়েতে তাঁর স্ত্রীপুত্রের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে, তখন গভীর জলের তলায় তাঁর পাঁজরের ওপর দিয়ে হয়তো খেলা করে বেড়াচ্ছে মেঘনার মাংসলোলুপ কামঠের দল।

তবু—তবুও তিনি মরতে চাননি। মরতে চাননি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে। তিনি লেখক, তিনি শিল্পী। প্রথম যেদিন কাব্যসাধনায় পা বাড়িয়েছিলেন, কলেজী ছাত্রের স্বপ্নভরা চোখ নিয়ে যেদিন প্রথম দেখেছিলেন জীবনকে—সেদিন সাহিত্য ছিল নিজের জন্যে; লঘু তরল কৌতুকের উচ্ছ্বাসে সংসারকে এক ঝলক হাসি আর আনন্দ বিলিয়ে যাবেন—শুধু এইটুকুই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ নতুন চোখ নিয়ে দেখেছেন মানুষকে—দেখেছেন শোষণ আর নির্দয়তার নির্মমতম রূপ, শুনেছেন দেশের বুকফাটা আকুল কান্না। সেই শোষণকে তিনি ফুটিয়ে তুলবেন, সেই কান্নাকে বাণী দেবেন, তাঁর নতুন রচনায়—এই প্রতিজ্ঞাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। চোখের জল আর বুকের রক্ত মিশিয়ে সদ্য শেষ করেছেন তাঁর এই বেদনা জর্জর নাটকের পাণ্ডুলিপি। কিন্তু এ নাটক আর সূর্যের আলোয় আত্মপ্রকাশ করবে না—এই কালো রাত্রির কালো জলে তার হরফ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে!

—বাঁচতে চাই—বাঁচতে চাই আমি—আধ-ডোবা নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে একটা চাপা গোঙানির মতো বেরিয়ে এল তাঁর গলা থেকে। বাঁচতে চাই এই সত্যকে প্রকাশ করবার জন্যে, বাঁচতে চাই এই দুঃসহ দুঃখকে ঘোষণা করবার জন্যে, বাঁচতে চাই মানুষকে তাঁর মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবার জন্যে! কিন্তু—

—কর্তা, বেঁচে আছেন?—বহুদূর থেকে যেন কার উল্লসিত চিৎকার ভেসে এল।

—কর্তা, চর পাওয়া গেছে—আর একটা চিৎকার শোনা গেল তার সঙ্গে সঙ্গেই।

চর পাওয়া গেছে! বাঁচবার আশা ধ্বক করে তাঁর হৃৎপিণ্ডের ওপর যেন হাতুড়ির ঘা মারল একটা। কিন্তু ভুল শুনলেন না তো? তাঁর নিজেরই আকাঙ্ক্ষার কল্পধ্বনি একটা শব্দ-মরীচিকা হয়েই তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চায় না তো? মেঘনার এই নির্জন তরল শ্মশান থেকে তাঁকে বিদ্রূপের মায়াকণ্ঠ শোনাচ্ছে না তো অপমৃতের দল?

শিউরে উঠে দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখবার মতো কিছু যেন খুঁজে পেলেন না, শুধু শক্ত করে বুকের কাছে তাঁর নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপিটাকে আঁকড়ে ধরলেন।

কিন্তু না, শোনবার ভুল নয়। মানুষের গলা, শরীরী সত্তার কণ্ঠস্বর। তাঁরই নৌকোর মাঝি আকবর আলি তাঁকে ডাকছে।

—কর্তা, কর্তা, বেঁচে আছেন আপনি? চর পাওয়া গেছে।

—বেঁচে আছি—এইবার যান্ত্রিকভাবে সাড়া দিলেন তিনি। নিজের আর্ত চিৎকারটায় নিজেই চমকে উঠলেন আকস্মিকভাবে।

—নৌকো এখনো ডোবেনি তো? —মাল্লা কয়েজ সাগ্রহ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে।

—না, এখনো ডোবেনি—আবার আর্তকণ্ঠে সাড়া দিলেন।

—আমরা আসছি—দূর থেকে জবাব এল। তারপরেই শুনতে পেলেন সাঁতারের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। নৌকোর খোল কল্‌কল্ করে ভরে উঠছে, আর চার পাঁচ মিনিট দেরী হলেই তিনি তলিয়ে যাবেন। তার আগে, তার আগেই ওরা এসে পড়তে পারবে তো? বাঁচাতে পারবে তো তাঁর এই নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপিকে, তাঁর জীবনভাষ্যকে?

প্রতিটি মুহূর্তের মধ্য দিয়ে শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে। নৌকোর খোলে জলের কল্‌কল্ শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যেন। আর কতক্ষণ, আর কতক্ষণ? মৃত্যুকে যখন নিশ্চিত জেনেছিলেন, তখন কোনো তাড়া ছিল না—তখন সময় ছিল মন্থর আর বিলম্বিত; কিন্তু জীবনের প্রত্যাশা যখন কাছে দাঁড়িয়েছে, তখন সময় যেন বড় বেশি তাড়া করে ফুরিয়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে!

কতক্ষণ? আর কতক্ষণ?

জলকাটার শব্দ ক্রমশ কাছে আসতে লাগল, মিশতে লাগল তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে। তারপরেই দু-তিনটে মাথা যেন হঠাৎ ভেসে উঠল জলের তলা থেকে।

—খোদা মেহেরবান কর্তা।—হাঁপাতে হাঁপাতে আকবর আলি বললে, মস্ত চর পাওয়া গেছে। তাঁরই দোয়ায় খানিক সাঁতরাতেই পায়ের তলায় মাটি ঠেকল। আমরা নৌকো টেনে চরে তুলে দিচ্ছি—

পাণ্ডুলিপিটা বুকের কাছে চেপে ধরে মিত্র মশাই ছইয়ের ওপর বসে পড়লেন। অসহ্য আবেগে স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে, একটা কথাও যেন বলতে পারছেন না।

তিনজনে মিলে নৌকো টেনে নিয়ে চলল। কত সেকেণ্ড, ক মিনিট, ক ঘণ্টা? সময়ের হিসেব তিনি করতে পারলেন না। শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে, যেখানে নক্ষত্রের দ্যুতিসভা আনন্দের উজ্জ্বলতায় বিকীর্ণ হয়ে আছে; অনুভব করতে লাগলেন ভিজে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে দূর পৃথিবীর কোনো নিশিথগন্ধা ফুল আবার তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে জীবনের অভ্যর্থনা!

ঘ্যাস-স্-স্! চরের পলিতে নৌকো ঠেকল। তিনজন মানুষ একহাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

শক্ত মাটিতে দাঁড়াবার আশ্বাসে নৌকোর বাইরে পা বাড়াবার উপক্রম করতেই হাঁ হাঁ করে নিষেধ জানাল আকবর।

—নামবেন না হুজুর, নামবেন না। চর বটে, কিন্তু ডাঙা নেই। গোটাটাই হাঁটুজল।

—তা হলে?

—ওপরেই বসে থাকুন কর্তা। কোনো নৌকো আসতে দেখলেই আমরা ডেকে দেব।

মাঝিমাল্লারা একে একে উঠে পড়ল নৌকোয়। একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আকবর আলি বললে, সোভান্ আল্লা। অন্ধকার

নদীর দিকে চোখ মেলে দিয়ে মিত্র মশাই একই জয়গায় ঠায় বসে রইলেন।

অন্ধকার। রাত্রিটা যেন স্থির আর স্তব্ধ হয়ে বসেছে মেঘনার ওপরে। যেন নিজের এই চঞ্চল কালো জলটা দিগ্‌দিগন্তের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে-দূরান্তে চলে গেছে, আর আকাশ একটা স্থির সমুদ্রের মতো নেমে এসে মিলেছে তার সঙ্গে। কোথাও মাটি নেই—মানুষের আশ্রয় নেই—ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রথম ফুলের গন্ধ এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বে না। যেন দৃষ্টির আদি পর্বে ফিরে গেছে সমস্ত—যেখানে নীরন্ধ্র তমসার আড়ালে সূর্যের বীজ এখনো অঙ্কুরিত হয় নি। যেখানে প্রথম মহীরুহ এখনো মাটির গভীরে অতল সুপ্তিতে আচ্ছন্ন; যেখানে প্রথম জীবন নিরবয়ব বস্তুপুঞ্জের ভেতরে একটা আশ্রয় এখনো সন্ধান করে ফিরছে!

মাঝিরা নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করছে চাপা গলায়, মিত্র মশাই শুনতে পেলেন না, শোনবার চেষ্টাও করলেন না। চারদিকে অবিরাম জলের কলধ্বনি। অন্তহীন শূন্যতার ভেতর দিয়ে গতিহীন শব্দের তরঙ্গ বয়ে চলেছে। কোনো কিছুর কোনো অর্থ নেই। একটা নিরর্থকের মাঝখানে আরো নিরর্থকভাবে তাঁর মনোময় অস্তিত্বটাই কেবল সজাগ হয়ে আছে।

কিন্তু না। মরতে তিনি চান না এই ত্রিশ বৎসর বয়সে। এতদিন নিজের জন্য বাঁচতে চেয়েছিলেন, আজ বাঁচবার আর একটা তাৎপর্য ধরা পড়েছে তাঁর কাছে। এত কথা ভাববার আছে—এত বিচিত্র বিরাটভাবে উপলব্ধি করবার আছে। তিনি লেখক, তিনি শিল্পী; কিন্তু সেই শিল্প কি শুধু নিজেকে নিয়ে, সেই লেখা কি কেবল তাঁর চেনা পল্লীসমাজের জামাইষষ্ঠীর কৌতুকের মধ্যেই সমাপ্ত? তাঁর সৃষ্টি কি শুধু বাঁধা থাকবে তাঁরই আত্মতৃপ্তির গণ্ডিটুকুতে?

ভুলে গেলেন একটু আগেই সেই আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি, ভুলে গেলেন এই অন্তহীন শূন্যের ভেতর তাঁর আরো শূন্যময় অস্তিত্বের

অনুভূতি। অন্ধকার নিশিপটের ওপরে দেওয়ালের লেখার মতো ফুটে উঠতে লাগল আগামী সাহিত্যের রূপ। শুধু তুমি-আমি, তোমার আমার অভ্যস্ত জীবন, তার চির-চেনা সুখ-দুঃখের নানা রঙের বুদ্বুদ —এ নিয়ে কী দেওয়া যাবে, কতটুকু দেওয়া যাবে মানুষকে? যে দেশকে তিনি জেনেছিলেন ভূগোলের পাতায়, যে দেশের তীর্থছবি তিনি এঁকেছিলেন তাঁর কাব্যগঙ্গার তটে তটে, সেই দেশের সবটাই তো সুখ আর পুণ্যের স্বর্গভূমি নয়! যশোর, খুলনা, নদীয়া— বৃহত্তর বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তে যে ভয়াল মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছেন তিনি, দেখেছেন লাঞ্ছনা আর অপমানের যে মর্মদাহী রূপ, সেই তাঁর দেশ, সেই তাঁর সাহিত্য!

রাত্রির অন্ধকার—মেঘনার কালো জল পার হয়ে আর এক অন্ধকার, আর এক অতল-মৃত্যু ভেসে উঠল চোখের সামনে। দেখছেন, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন!

একটা কুঠি বাড়ির ছায়া-স্তম্ভিত রুদ্ধ ঘর।

দেওয়ালের গায়ে জোড়া জোড়া লোহার কড়া বসানো—আর সেই কড়ার গায়ে পশুর মতো মানুষ বাঁধা—তাঁর নিজের দেশের মানুষ। অনাহারে শীর্ণ তাদের কালো কালো দেহ, বোবা যন্ত্রণায় বিস্ফারিত তাদের বিমূঢ় দৃষ্টি, অসহ্য নির্যাতনে তাদের সমস্ত শিরাস্নায়ু সংকুচিত।

একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দে খুলে গেল লোহার দরজা। মশালের একরাশ রক্তিম আলোয় কড়ায় বাঁধা মানুষগুলির ছায়া কতগুলো প্রেতমূর্তির মতো নোনাধরা দেওয়ালের ওপর দুলতে লাগল। ভারী পায়ে উদ্ধত বুটের শব্দ তুলে একটা সাদা মানুষ এসে দাঁড়াল তাদের সামনে।

ঘর কাঁপিয়ে গম্‌গমে গলায় সে জানতে চাইল: রাজী?

কড়ার গায়ে শবদেহের মতো ঝুলেই রইল মানুষগুলো—কেউ কোনো জবাব দিলে না!

—ড্যাম্—সোয়াইন!—বাঘের মতো গর্জে উঠল লোকটা, সাপের ছোবল মারার মতো আওয়াজ তুলল তার হাতের চাবুকটা। তারপর—

তারপর চলতে লাগল তার চাবুক। কালো মানুষগুলোর মুখ থেকে যন্ত্রণার গোঙানি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। কালো চামড়ার ভেতর থেকে ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল লাল রক্তের ধারা—মানুষগুলোর মাথা কাত হয়ে ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়তে লাগল।

অস্ফুট কণ্ঠে কে বললে, জল—একটু জল—

—জল?—লোকটা হিংস্র হায়েনার মতো শব্দ করে হেসে উঠল: শালা, তোর মুখে—

একটা অশ্রাব্য পাদপূরণ! মশালের রাঙা আলোয় তার সাদা দাঁতগুলোকে অদ্ভুত জান্তব দেখাতে লাগল, মনে হল যে এখনি সে এদের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এদের বুকের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে! তার চোখে-মুখে নরখাদক-রাক্ষসের একটা প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধা!

লেখক নিজের পাণ্ডুলিপিটাকে আবার মুঠো করে চেপে ধরলেন বজ্রমুষ্টিতে! না, একে এমন লুকিয়ে থাকতে দেওয়া যাবে না এই অন্ধকার কুঠিবাড়ির ছায়াস্তম্ভিত পীড়নকক্ষে। একে প্রকাশ করতে হবে—ভেঙে দিতে হবে এই সাপের বিবর। এই তাঁর সাহিত্যের সত্য, এই তাঁর পৃথিবীর কাছে একমাত্র বক্তব্য।

—কাঁ—কাঁ—কাঁ—

লেখক চমকে উঠলেন। রাত্রির বুকের ভেতর দিয়ে কর্কশ আর্তনাদের কয়েকটা তীক্ষ্ণ তীর যেন ছুটে চলে গেল। যেন কুঠি-বাড়ির সেই মৃত্যু ঘরের মধ্যে থেকে কতগুলো মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণা হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে!

—কাঁ—কাঁ—কাঁ—কঁক্—কঁক্—

রাত্রিচর পাখির কান্না। কিন্তু ওরা তো পাখি নয়! ও মৃত আত্মার অভিশাপ। ও অভিশাপ নিজের ওপর—দেশের ওপর—দেশের প্রতিটি মানুষের ওপর। ওই অভিশাপের তিনিও অংশীদার; লেখক হিসেবে, শিল্পী হিসেবে, মানুষ হিসেবে তাঁরও যতটুকু দায়িত্ব ছিল, তিনিই বা তার কতখানি করতে পেরেছেন?

—কর্তা, ভারী মুশকিল হল যে ?—আকবর আলির গলা মুহূর্তে তাঁকে নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে আনল।

—আবার কী ?

—এখনো তো কোনো নৌকো দেখা যাচ্ছে না।

—বেশ তো, সকাল হলে দেখা যাবে।

—না, কর্তা, ল্যাঠা আছে যে!—আকবর আলিকে আরো শঙ্কিত মনে হল: এখন ভাঁটার টান চলছে, তাই চড়ায় জল নেই। কিন্তু আর খানিক পরেই যে জোয়ার আসবে। সে জোয়ারে এই চড়া তলিয়ে যাবে। তখন কী যে হবে—

কী যে হবে! জোয়ার আসবে, এই চর তলিয়ে যাবে, তিনি তলিয়ে যাবেন। অর্থাৎ মৃত্যু এখনো তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। পেছনে সে ঘুরছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে ছায়ার মতো। একঘণ্টা আগে সে পরাস্ত হয়ে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু আশা ছাড়েনি। আহত ইঁদুরকে খানিক দূর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে শিকারী বেড়াল যেমন মজা দেখতে থাকে, তারপরে তীর বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, তেমনি—ঠিক তেমনি!

মাঝ গাঙে নৌকো যদি ডুবে না থাকে, তা হলে চড়ার ওপরেই ডুবে যাবে এবারে।

—কী হবে হুজুর ?

কী হবে। এর উত্তর তিনি কী দেবেন—কী তিনি জানেন! যখন নৌকোয় তাঁকে ছেড়ে সকলে পালিয়ে গিয়েছিল তখন যা, তাই হবে! ত্রিশ বৎসর বয়সই তিনি পৃথিবী থেকে মুছে যাবেন। আর সেই সঙ্গে মুছে যাবে তাঁর নতুন সত্য, তাঁর নতুন উপলব্ধি।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে কথা ভেবে লাভ নেই। যখন মৃত্যু আসবে তখন আসুক। যে আসবে, তাকে রোধ করা যাবে না! তার আগে আরও কিছুক্ষণ আশা করা যাক আকাশের ওই নক্ষত্র দীপায়নের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে; আশা করা যাক কান পেতে মেঘনার কালো জলের কলঝঙ্কার শুনতে শুনতে;

আশা করা যাক এই সজল বাতাসের স্পর্শ সর্বাঙ্গে মাখিয়ে নিতে নিতে।

হাঁ—বাঁচা তার দরকার। নিজের জন্য নয়—তাঁর সত্যের জন্য। সেই সত্যের রূপ তিনি যা দেখেছেন, সকলকে না দেখাতে পারলে মরেও তাঁর মুক্তি নেই। ওই অভিশপ্ত আত্মাগুলোর মতো অন্ধকার নদীর ওপর দিয়ে তাঁকেও অমনি করে নিরুপায় আর্তনাদে ডেকে ফিরতে হবে!

একটা অপরিসীম জীবনের আহ্বানে আবার তিনি শূন্যদৃষ্টি মেলে দিলেন। দেখলেন, ঘোড়ার খুরে-খুরে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে পাকা ধানের খেত, দেখলেন ফাটা মাটির বুকের ভেতর থেকে থেকে অসংখ্য নাগশিশুর মতো মুখ বের করছে নতুন ফসলের বিষাক্ত চারা। দেখলেন দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে চলেছে, শেয়াল ডেকে ফিরছে পোড়া ভিটের ওপর।

গুয়াতেলি গ্রামের সেই ভদ্র পরিবার। এই নির্যাতন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের ওপর সেই দুঃসহ পীড়ন। আগুনে তাঁদের ঘর দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে, মিথ্যে অপরাধে অভিযুক্ত বৃদ্ধ বাপ জেলখানায় গলায় ফাঁস পরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, বাড়ির উঠোনে পড়ে আছে বল্লমের ঘায়ে বিদীর্ণ বক্ষ জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃতদেহ! মেয়েদের বুকফাটা কান্না আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

সব—সব তিনি লিখেছেন। নিষ্ঠুর নগ্ন সত্যের একটি অক্ষরও বর্জন করেননি; এতটুকু আবরণ টেনে দেননি সত্যের ওপর। এই বই তাঁকে প্রকাশ করতে হবে—যেমন করেই হোক দেশের মানুষের পক্ষ থেকে তুলে ধরতে হবে একটা বলিষ্ঠ কঠোর প্রতিবাদ। হয়তো চাকরি যাবে, হয়তো জেল খাটতে হবে, হয়তো নির্যাতনের সীমা থাকবে না। একহাতে রিভলভার বাগিয়ে যারা ঘোড়ার ক্ষুরে সারা দেশ তছনছ করে ফিরছে, তারা হয়তো এত সহজেই তাঁকে নিষ্কৃতি দেবে না। তবু—তবুও তাঁকে এই বই

প্রকাশ করতে হবে—নিজের জীবনের মূল্য দিয়েও প্রকাশ করতে হবে!

—কর্তা, আর তো ভরসা নেই—আকবর আলির গলা।

লেখক জবাব দিলেন না।

—জোয়ার আসবার সময় হয়ে এল। জল থম্ থম্ করছে। রাত মাঝ পহর। একটা নৌকোও তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ছই থেকে এসে দাঁড়ালেন গলুইয়ের ওপর। নেমে এলেন এতক্ষণ পরে।

—আমি মরব সে জন্য দুঃখ নেই আকবর। কিন্তু আমার এই খাতাখানা তোমাকে বাঁচাতেই হবে। যেমন করেই হোক—এ খাতা বাঁচাতেই হবে। যে কোনো ডাকঘরে গিয়ে আমার নাম করে বলো—মরবার আগে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু দিয়ে গেছেন। এই খাতায় আমার বন্ধু বঙ্কিমবাবু, ডেপুটির নাম ঠিকানা লেখা আছে। খাতাখানা যেন তাঁরই কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

—হুজুর—আকবরের স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

—মেঘনার মাঝি তুমি আকবর, তুমি পারবে। তোমার অসাধ্য কাজ নেই। গামছা দিয়ে তুমি এ খাতা পাগড়ির মতো মাথায় বেঁধে নাও, যাতে জলে হারিয়ে না যায়, যাতে এর একটা হরফও মুছে না যায়। এ শুধু আমার খাতা নয় আকবর, এ তোমার খাতা, এ সারা দেশের খাতা!

আকবরের দুই চোখ জলে ভরে এল। আসন্ন জোয়ারের সম্ভাবনায় থমথম করতে লাগল কালো রাত্রির কালো মেঘনা। আর একবার প্রেতাত্মার কান্নার মতো নিশাচর পাখি ডাক দিয়ে গেল : কা—কা—কা—

লেখক আকাশের তারার দিকে চেয়ে রইলেন। হয়তো এই শেষ দেখা। এর পরেই অতল তমসা—সেখানে কখনো তারা ওঠে না, রাত্রি কখনো প্রভাত হয় না। নাই হোক। তিনি মুছে যাবেন। কিন্তু তাঁর সত্য, তাঁর বেদনা সারা দেশের মর্মছেঁড়া অগ্নিবাণী হয়ে বেঁচে থাকবে।

—আল্লা মেহেরবান—হঠাৎ আকস্মিক বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল ফয়েজ। দূরে একখানা বড় নৌকো আসছে, মিটমিট করে জ্বলছে তার আলো।

—আল্লা মেহেরবান—তারস্বরে প্রতিধ্বনি করলে আর সকলে। আর দীনবন্ধু মিত্র, তাঁর 'নীল-দর্পণ নাটকে'র পাণ্ডুলিপি বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে দেখতে লাগলেন ওই দূরের আলোটার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুদূর প্রভাতও আভাসিত হয়ে উঠছে। নতুন জীবন—নতুন সাহিত্য।

প্রতিনায়ক

বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতো এক টুকরো হাসিতে আলো হয়ে উঠল ওর মুখ। ও আস্তে আস্তে বললে, তুমি তাহলে সত্যিই এলে ?

—তোমার কী মনে হয় ?—আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। জোর করেই।

আগেকার দিন হলে এর পরে একটা তির্যক জবাব দিত ও। ঠোঁটে না হোক, অন্তত চোখের কোণায় একটা তীক্ষ্ণ হাসি জ্বলজ্বল করে উঠত ওর। কিন্তু আগেকার দিন আর অনেকদিন পরে। কত তফাত—কত ব্যবধান ! মাঝখানে ক্যালেণ্ডারের অসংখ্য ছেঁড়া পাতা, অগণিত ঝরা পালক, অনেক কালবৈশাখী আর মৌশুমী হাওয়া, আর জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ানে কয়েক লক্ষ (অথবা তারো বেশি ?) নতুন নাম। এই সব রাশি রাশি পাতা, পালক, ধুলো-বালির চিকের আড়াল থেকে ওকে আমি দেখলাম—ও আমাকে দেখল। আমি সংশয়ের হাসি হাসলাম—ওর মুখে পড়ন্ত রৌদ্রের দূরত্ব ঘনিয়ে রইল।

বালিশে ভর দিয়ে ও একটুখানি উঠে বসবার চেষ্টা করল। শুকনো ঠোঁটের ছু'পাশে কয়েকটি কুঞ্চিত যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গেল। এটুকু শক্তি আজও তা হলে ওর অবশিষ্ট আছে। মনে পড়ে গেল স্টিমার ধরবার জন্যে একবার চার মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছিলাম ছু'জনে। স্টিমারে উঠে ও যখন জুতো খুলল, তখন সভয়ে আমি দেখলাম, ছুটো ধারালো লোহায়

ওর পা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। অথচ এই চার মাইলের মধ্যে আমি ঘুণাক্ষরেও সেটা বুঝতে পারিনি।

ও বললে, সত্যি—কত কাজ তোমার। চাকরি আছে, টিউশন আছে। তার ভেতরে সময় করে তুমি আসতে পারবে আমি ভাবিনি।

—খবর পেলে আরো আগেই আসতাম—আমি জবাব দিলাম। মিথ্যে কথাই বলতে হল। মিথ্যেকে আজো ও ঘৃণা করে এ আমি জানি। কিন্তু ওর রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে সত্যের আঘাত দেবার সৎসাহস আমি রাখি না। অপ্রিয় সত্য বলবার ধর্ষকামী বিলাসিতাকে যারা স্পষ্টভাষিতা নাম দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, আমি তাদের দলের নই।

ও বললে, দাঁড়িয়ে আছো কেন? বসবে না একটু?

একটা সুযোগ হারালাম আমি। এখুনি বলতে পারতাম, 'না—আজ যাই, একটা টিউশন আছে।' নিজের অপরাধবোধটাকে নিরঙ্কুশ করবার জন্যে সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে পারতাম: 'শিগগিরই আর একদিন আসব।' কিন্তু বলা হল না; হঠাৎ কোথা থেকে আমার চোখের সামনে দুলে গেল সেই স্টিমার ঘাটে যাওয়ার চার মাইল রাস্তাটা, নারকেল বন আর আকাশ আর জলের শ্যামলনীল-অভ্রের ঝলক। এক মুহূর্তের জন্যে আমাকে উন্মনা করল সেই বন-গোলাপের ঝোপটা—যার থেকে দুটো ফুল ওকে আমি তুলে দিয়েছিলাম।

অতএব পাশের লোহার চেয়ারটা টেনে আমি বসে পড়লাম। অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে আমি ভুলে গেলাম, এই চেয়ারগুলোতে দু'বার আমার জামা ছিঁড়েছে—দু'বার মরচের দাগ ধরে গেছে। আমার সতর্ক বুদ্ধি মনে করিয়ে দিল না, এই জামাটায় অন্তত আরো তিনটি দিন আমার চালানো দরকার।

ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সেই আগেকার মতো ওর চোখে আজ আর জিজ্ঞাসা নেই, তীব্রতাও নেই। একটা চাপা

কৌতুকের খোঁচাও কোথাও নেই। দৃষ্টিতে একটা শান্ত করুণা মাখিয়ে ও আমাক দেখতে লাগল। যেন ওর অসুখের খবর পেয়ে আমি ওকে দেখতে আসিনি—আমারই রোগশয্যার পাশে এসে বসেছে ও।

—কি রকম বুড়ো হয়ে যাচ্ছ এর মধ্যেই!—স্নেহকোমল গলায় ও বলতে লাগল: চশমা নিয়েছ, কালো হয়ে গেছে চোখের কোল দুটো। মাথার অত কোঁকড়া চুল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। হঠাৎ পথে দেখলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না।

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। চিরদিন—চিরদিনই কি ও আমাকে করুণা করেই যাবে? ওর মনের কাছে একটা সহানুভূতির পাত্র হয়েই আমি থাকব চিরকাল? আজকের এই রোগশয্যাতেও আমাকে ও করুণা করবার সুযোগ দেবে না?

আজ আর সে চোখ ওর নেই—যেখানে দুপুরের রৌদ্রজ্বলা নদীর মতো কী একটা ঝক্‌ঝক্ করত। সে হাসি নেই—যাতে চমকে যেত ছুরির ধার। ওর দুটো অন্ধকার কোটর আর বেলাশেষের বিষণ্নতার দিকে তাকিয়ে আমি যেন আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারলাম।

—আমার কথা থাক। কিন্তু এ কি হয়েছে তোমার শরীর?

—খুব খারাপ?—ও আলতোভাবে জানতে চাইল।

—সেটা কি আমার মুখ থেকে শুনতে চাও?

—না, তার দরকার নেই। ওটা এত শুনেছি যে, তুমি যা বলবে তা আমার আগে থেকেই মুখস্থ হয়ে আছে। খারাপের সঙ্গে যতগুলো বিশেষণ জোড়া যায় আমার ক্ষেত্রে তাদের একটাও বাকী নেই—কেমন, এই তো?

সেই পুরোনো দিনগুলো হাওয়ায় ভেসে-আসা এক ঝলক গন্ধের মতো হঠাৎ ঝরে পড়ল ওর কথা থেকে। আমি নড়ে বসলাম, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল লোহার চেয়ারটা। কিন্তু তারপরেই আমার মনে হল: শুধুই এক ঝলক, তার বেশি নয়। এই আবছায়া অন্ধকার ঘর—কেঁপে ওঠা পুরোনো দেওয়ালে স্যাঁৎসেঁতে লালচে রঙ—

জানলার গায়ে একটা ফোকরের ভেতরে আরশোলার শুঁড় আর ঘরময় ওষুধ-ওষুধ একটা অসুস্থ গন্ধ—এর মধ্যে ওর এই আকস্মিক সপ্রতিভতা শুধু ব্যতিক্রম ছাড়া কিছুই নয়।

পকেট থেকে আস্তে আস্তে রুমাল বের করলাম, আরো সময় নিয়ে মুছে ফেললাম ঘামে ভেজা কপালটা। তারপর জিজ্ঞাস করলাম, কী করে হল এ-রকম?

আবার করুণার্দ্র হাসি দেখা দিল ওর মুখে। অনুকম্পার স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে ও বললে, কী করে যে হল তা ডাক্তারেরাই জানে না—আমি বলব কোথা থেকে?

—তার মানে? এখনো ডায়াগনোসিস হয়নি?—বন্ধ জানালাটার নিচের ফোকরে আরশোলার শুঁড় দেখতে দেখতে আমি প্রশ্ন করলাম।

—কই আর হল! প্রথম সন্দেহ হয়েছিল প্লুরাল, তারপর শুনলাম রাজব্যাধি—অর্থাৎ যক্ষ্মা—এখন শুনছি রাজাও নয—স্বয়ং সম্রাটের আবির্ভাব হয়েছে।

—সম্রাট!

—হ্যাঁ, সম্রাট! --যেন ঘরোয়া কোনো খবর দিচ্ছে, এমনিভাবে ও বললে, ক্যান্‌সার।

ক্যান্‌সার! লোহার চেয়ারের ওপরে আবার আমি সশব্দে নড়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই ঝাপসা অন্ধকার ঘরটাকে আরো ঝাপসা মনে হল—ছায়াপড়া দেওয়ালে দেওয়ালে দেখতে পেলাম মৃত্যুর সঞ্চার—আর, আর ওষুধের ওই তীব্র গন্ধটা। মনে পড়ে গেল, আমাদের পাশের বাড়ির মহাদেববাবু কী একটা সংক্রামক রোগে মারা যাওযার পরে তাঁর শূন্য ঘরটা থেকে অমনি একটা গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ত!

—সে কি!—অবরুদ্ধ আওয়াজ করলাম আমি।

ও বললে, সেই জন্যেই তো। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আর ভাবনা নেই কোনো।

ভাবনা না থাকাটা এমন করে ও বললে তাতে আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। সে গলায় নৈরাশ্য নেই—ক্ষোভ নেই—অভিযোগ নেই—কিছুই নেই। আছে একটা দমচাপা শূন্যতা। সে শূন্যতা এমনি বর্ণহীন, এমনি নির্বেদ যে ওই কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের একটা আঙুল সম্পূর্ণ কেটে গেলেও কোনো যন্ত্রণা অনুভব করতাম না আমি। কিংবা এক্ষুণি—এই কথাটা শোনবার মুখে, আমি যদি একটা পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে থাকতাম আর ও বাতাসের শব্দের মতো ফিসফিসে গলায় আমাকে বলত, 'তুমি নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো'—আমি দ্বিধা করতাম না—এক পলকের জন্যেও না!

খুব শীত করলে যেমন হয়, আমি হাতের পাতা দুটো একসঙ্গে ঘষলাম—যেন বৈদ্যুতিক করে নিতে চাইলাম শরীরটাকে। তারপরে বললাম, ক্যান্সারের তো চিকিৎসা চলে।

—সব সময় চলে না।—এবারে ও একটু বিস্তৃত করে হাসল। আমি দেখতে পেলাম, গাল দুটো ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দাঁতগুলো বড় বেশী উঁচু হয়ে উঠেছে ওর: বিশেষ করে যখন ডাক্তারেরা কিছুতেই ঠিক করতে পারে না ক্যান্সারটা পেটে, পিঠে না বুকে। আরো চলে না তাদের—যাদের মাসের রোজগার কোনোমতেই একশো পঁচিশটাকার বেশি নয়।

—তাহলে—আমি জোর করে চিন্তিত হতে চাইলাম, কিন্তু ছলনার এই অতি সূক্ষ্ম আবরণটুকু ও রাখতে দিল না। আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললে, তাহলে আর কিছুই নেই। একেবারে নির্ভাবনায় বসে থাকা। দাঁতে দাঁত চেপে পৃথিবীর সবচেয়ে বীভৎস যন্ত্রণাকে সহ্য করে যাওয়া। আর, আর একজনকে ডাকা, যে এই সময় আমাকে পরম বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারে। ওর গলার স্বর আরো শূন্য আরো শীতল হয়ে এল, তাইতো দশ বছর পরে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

—আমি? কী করতে পারি? হঠাৎ আমার মনের মধ্যে

কালো একটা সন্দেহ সাপের মতো ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল, আমি কী করতে পারি তোমার জন্যে ?

যন্ত্রণা-জর্জরিত শরীরটাকে ও যতদুর সম্ভব ঝুঁকিয়ে দিলে আমার দিকে। এক গুচ্ছ রুক্ষ চুল ওর মুখের একদিক ঢেকে নেমে পড়ল, ওর কপালের সিঁদুরের ফোঁটাকে মনে হল প্রকাণ্ড একটা রক্তের বিন্দু। চাপা গলায় বললে, বিষ এনে দিতে পারো আমাকে, বিষ ?

বিষ ? আমি প্রতিধ্বনি করলাম। কিন্তু কথাটা ঠোঁট পর্যন্ত এসেই থামল, অথবা বাইরের হাওয়ায় ক্ষীণতম একটা শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করল, আমি জানি না।

তেমনি ঘরোয়া ভঙ্গিতে যেন চকোলেট এনে দিতে বলছে এমনি নির্লিপ্তিতে ও বললে, পটাসিয়াম সায়ানাইড কিংবা স্ট্রিকনিন কিংবা বেলেডোনা কিংবা যা হোক একটা কিছু। তুমি তো বড় একটা কেমিস্টের দোকানে চাকরি করো শুনেছি, তোমার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

—কী পাগলামি করছ তুমি! –মুমূর্ষুর মতো আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

ও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। সেই স্নেহ, সেই অনুকম্পা, সেই করুণা। তারপর আস্তে আস্তে সে দৃষ্টিটা মিলিয়ে গেল, যেন চকিতের জন্যে চোখদুটো দুপুরের নদীর মতো জ্বলে উঠেই একটা পুরনো ইঁদারার অন্ধকার জলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ও বললে, মনে আছে, চার মাইল রাস্তা হেঁটে এসে আমরা সেদিন স্টিমারে উঠেছিলাম ?

সেই সম্মোহিত শীতলতা ঘনাচ্ছে আমার চারদিকে। আঙুলের ডগাগুলো যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি বললাম, আছে।

আলো-বাতাস আশা-আনন্দ সব কিছু ফুরিয়ে যাওয়া সেই ফাঁকা গলায় ও বলে চলল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন,

তাই পালানোর ব্যবস্থা করেছিলাম তোমার সঙ্গে। কোথায় তুমি নিয়ে যাবে জানতে চাইনি, জানবার কৌতূহলও ছিল না। শুধু মুক্তিই চেয়েছিলাম।

আমি আবার একটা কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু ওর অন্ধকার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা খুঁজে পেলাম না।

ও বলে চলল, কিন্তু মাঝপথে ধরা পড়ে গেলাম। তুমি কলকাতায় পালালে, আমাকে ফিরে আসতে হল। কিন্তু লাভ হল এই যে, বিয়েটা ভেঙে গেল। আর সেই কেলেঙ্কারীটা অনেক দিন জেগে রইল লোকের মনে, যার জন্যে শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেয় একজনকে আমি বেছে নিতে পেরেছিলাম। সে কথা থাক। সেদিন যে প্রয়োজনে তোমায় ডেকেছিলাম; আজও সেই জন্যেই ডেকেছি। তবে এবার আর বেশী কষ্ট করতে হবে না—শুধু একটুখানি বিষ এনে দিলেই চলবে।

এতক্ষণের সমস্ত নির্বেদ—সমস্ত অবসাদ হঠাৎ আমার চারদিকে কতগুলো আগুনের ফুলকি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আর তাদের ছোঁয়ায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্বলে উঠল একসঙ্গে। দশ বছর পরে আমি একটা ভয়ঙ্কর নগ্ন সত্যকে আবিষ্কার করেছি। এতদিন ধরে যা ছিল আমার ঐশ্বর্য, যা ছিল আত্মপ্রসাদ, তা যে এতবড় কুৎসিত অপমান, কে জানত সে কথা! আজ আমি বুঝতে পারছি ওর কৌতুকতীক্ষ্ণ হাসির অর্থ, বুঝতে পারছি ওর ধারালো চোখের সমস্ত ইঙ্গিতগুলোকে। চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল কত বর্ষার সন্ধ্যার মেঘরাগ, কত বসন্তবাহারের সুর, কত আলাহিয়া বিলাওলের প্রসন্ন সকাল, কত তন্দ্রানিবিড় রাত্রের মৃত্যুমদির গম্ভীর মালকোষ! এই দশ বছর ধরে যাকে ভেবেছিলাম প্রেম—তা শুধু সীমাহীন ঘৃণা, যখন আমি পরিত্রাতার ভূমিকায় নামতে চেয়েছিলাম, তখন ও আমার হাতে দিয়েছিল জল্লাদের খড়্গ! আমার স্মৃতির আকাশ থেকে এক একটি করে প্রজাপতির পাখা ঝরে যেতে লাগল—এই ঘরের শীতল আবছায়ায় তারা আমার চারদিকে কেউটে সাপের খোলসের মতো

জড়ো হতে লাগল, শয়তানের সোনা যেমন ছোঁয়া লাগলেই শুকনো পাতা হয়ে যায়।

এইবারে আমার উঠে দাঁড়ানো উচিত, এইবারে আমার ছুটে পালানো উচিত এখান থেকে। কিন্তু আমি উঠে দাঁড়ানোর আগেই জুতোর জোরাল আওয়াজ করে সে ঘরে এল। ওর স্বামী।

কালো লম্বা লোকটা। মাথায় আমার চাইতে অনেক বড়। সমর্থ চেহারা, মোটা মোটা হাত পায়ের হাড়। লোকটাকে চিনি। আমাকে খবর দিতে গিয়েছিল।

ঘরে ঢুকেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

—এই যে, আপনিও এসে গেছেন। যাক সুখবরটা শোনাই। ফাইন্যালি জানা গেছে, রোগটা ক্যানসার নয়। আমার এক পুরোনো বন্ধু মাসখানেক হল বিলেত থেকে এম আর সি পি হয়ে এসেছে। তার সঙ্গেও দেখা হয়েছে। সে বললে, আজ বিকেলেই আসবে, চিকিৎসার সব দায়িত্ব নেবে সে।

—ক্যানসার নয়! তীব্র আনন্দে ও আর্তনাদ করে উঠল, আমি বাঁচব তা হলে! আস্তে আস্তে বুজে এল ওর চোখদুটো, তারপর এলিয়ে পড়ল বালিশে।

ওর স্বামী—সেই কালো লম্বা লোকটা যার হাত-পায়ের হাড়গুলো মোটা মোটা, আর মাথায় যে আমার চাইতে অনেক বড়, সে বললে, বাঁচবে বইকি তুমি, আরো অনেক দিন বাঁচবে। তা ছাড়া আরো খবর আছে যে। আসছে মাসে পঞ্চাশ টাকার একটা লিফ্ট পাচ্ছি আমি।

অসম্ভব জোরে, অদ্ভুত চেঁচানো গলায় কথাগুলো বললে লোকটা—আমার কানে যেন তালা ধরে যেতে চাইল। তারপর এগিয়ে গেল বন্ধ জানালাটার দিকে—বিকেল বেলায় দক্ষিণের জানলা এমনভাবে বন্ধ করে রেখেছে কেন? খুলে দাও—খুলে দাও। আলো আসুক, হাওয়া আসুক—

ক্যাঁচ করে খুলে গেল জানালা—কোথায় ডুবে গেল আরশোলার কুৎসিত শুঁড়! উদ্ধত হাওয়ার ঝলক আমার মুখে আঘাতের মতো

এসে পড়ল—আলোতে ধাঁধা লেগে গেল চোখে। এ ঘরে তো আমি আসিনি—এ ঘরে আমি আর থাকতেও পারব না।

—আজ আসি—আমি উঠে দাঁড়ালাম। ও চোখ মেলেও আর তাকাল না। তাকানোর প্রয়োজন ওর ফুরিয়ে গেছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো যখন পথে নেমে এলাম, তখন পেছন থেকে শুনতে পেলাম ওর স্বামীর ডাক, আবার আসবেন।

—আর আসব না—চিৎকার করে উঠতে গিয়েও আমি পারলাম না। এবার শব্দগুলো ঠোঁটের আগাতেও এল না, গলার শিরা পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়াল। একথা জোর করে বলবার শক্তি কি আমার আছে? আবার যদি কখনো ক্লান্ত, শিথিল, নিশ্চেতন অবসাদের মধ্যে ওর ডাক আসে, যখন নিজের একটা আঙুল কেটে ফেললেও যন্ত্রণার কোনো অনুভূতি আঘাত করবে না আমার মস্তিষ্কে, তখন—তখন সেই মুহূর্তে আমি কী করব?

দায়মোচন

তখন ওরা থাকতো দোতলা তেতলায়, আর ভূপেনরা ছিল ওদেরই একতালার ভাড়াটে। তনুশ্রীর বাবা হাজার টাকা মাইনে পেতেন আর ভূপেনের বাপ কোথায় কেরাণীগিরি করতেন দেড়শো টাকা বেতনে।

পদমর্যাদার তফাত থাকলেও তনুশ্রীর বয়েস তখন পনেরো, আর আর ভূপেনের বয়েস আঠারো। অর্থাৎ যে বয়সে মেয়েরা বীরপূজা করতে শুরু করে আর যে বয়সে কিশোর তার দেহে-মনে অনুভব করতে থাকে পৌরুষের প্রথম উত্তাপ। আই এস্ সি ফেল করা ভূপেনের সেই পুরুষমূর্তি ম্যাট্রিক পড়া তনুশ্রীর চোখে পড়ল পাড়ার সরস্বতী পুজো উপলক্ষে। গেঞ্জী আর সাদা প্যান্ট পরা ভূপেন জিম্‌নাস্টিক দেখিয়ে যখন সকলের উল্লসিত করতালি কুড়িয়ে নিলে, সেই মুহূর্ত থেকে একটা নতুন গর্ব আর আবিষ্কারের আনন্দে সমস্ত চেতনা মগ্ন হয়ে গেল তনুশ্রীর। তাদেরই একতলার ভাড়াটে ভূপেন আজকের এই জনসমাবেশের মধ্যে অনন্যতার গৌরবে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে—এই পরম বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে ভূপেনের ওপর একটা অধিকার বোধ জন্মে গেল, টেরও পেল না তনুশ্রী।

একতলার থেকে দোতলার দুরারোহ সিঁড়িটা দেখতে দেখতে একটি মাত্র ছোট ধাপে রূপান্তরিত হল। মর্যাদার তারতম্য ভুলে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে এক দিন বিমুগ্ধ চোখে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল স্বপ্নমগ্না কিশোরী আর নবজাগ্রৎ পুরুষ। তারও

পরে একটা বৃষ্টিনামা সন্ধ্যায় প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির নিচে ভূপেনের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে নিজের আংটিটি পরিয়ে দিয়ে তনুশ্রী বললে, আমি তোমাকে ভুলব না।

কিন্তু পনেরো বছরের কিশোরীর পৃথিবী। সে তো সূর্য ওঠার আগে আকাশে এক পোঁচ অস্থায়ী রঙ, সে তো হালকা কুয়াসার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি-জড়ানো ঘাসের ওপর কয়েক কণা শিশির। কতক্ষণ তার আয়ু? রঙ, কুয়াসা আর শিশিরের শূন্য রূপ একটু পরেই খর আলোয় ছিন্ন-ছিন্ন হয়ে যায়, সাদা লাল হলদে বাড়িগুলোর কৌণিক তীক্ষ্ণতা আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কালো পীচের পথে চিক-চিক করে উজ্জ্বল মসৃণ ট্রামের লাইন আর গ্যারাজের দরজা খুলে ক্লীনার যখন গাড়িটা সাফ করেতে থাকে, তখন তার চকচকে শরীরটার ওপরে একটা কঠিন দীপ্তি ঝকঝক করতে থাকে।

ট্রামের লাইন আর ঝকঝকে গাড়ি। ভূপেনের বাবা বাড়ি বদলালেন, ট্রামটা কত পেছনে ছিটকে পড়ল কে জানে। আর গাড়িটা তনুশ্রীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল—আংটি পরিয়ে দেওয়া সন্ধ্যাটা কোথায় যে হারিয়ে গেল জানতেও পারল না তনুশ্রী।

তবু একটা অবচেতন ভয় লুকিয়ে আছে তনুশ্রীর মনে—লুকিয়ে আছে একটা সুগোপন আতঙ্ক। সেদিনের সেই 'কাফ-লাভের' মোহ কবে কেটে গেছে চোখ থেকে—আজ সে কথা ভাবলে কী অদ্ভুত হাস্যকর মনে হয় সে সব। মনে পড়ে যায় ভূপেনের ভুল ইংরিজিতে কথা বলার চেষ্টা, তার গায়ে বেয়াড়া রকমের ছিটের শার্ট, পায়ের ময়লা কেড্‌স্ জুতো আর চোখের গোবেচারা দৃষ্টি। কী ছিল সেদিনের ভূপেনের মধ্যে? কিছুই না। নিজের মনের ভেতরেই সে তাকে সৃষ্টি করে নিয়েছিল—কিছু শারীরিক শক্তির বিশেষত্বে ভরা অত্যন্ত সাধারণ একটি ছেলেকে নিজের কল্পনার সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল সে।

জীবনে ওটা একটা অভিজ্ঞতার পর্ব মাত্র, তার বেশি কিছুই নয়। কিন্তু তবু ওই আংটিটা। কিছুই বলা যায় না, কোন্ দিন হয়তো

প্রেতের মতো অন্ধকার ঠেলে ওই আংটির অধিকার নিয়ে ভূপেন এসে দাঁড়াবে—কোন দিন হয়তো। আংটির ওপর মিনেতে খোদাই করা তার নামের স্বাক্ষর—হয়তো ওইটে দিয়েই সেদিন ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করবে। আঠারো বছর বয়সেই আই এস্ সি ফেল করে অমন স্বাস্থ্য নিয়ে যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই!

কিন্তু এ ভয়টাও ফিকে হতে হতে প্রায় মিলিয়ে এসেছিল। মিলিয়ে এসেছিল বারো বছর ধরে। কিন্তু কে জানত, বারো বছর পরে চন্দননগর থেকে কলকাতা ফেরার পথে শ্রীরামপুরে এসে গাড়িটা এমন করে বেঁকে বসবে, আর কৌতূহলী জনতার ভেতরে সকলের ওপরে নিজেকে তুলে ধরে প্রশ্ন করবে দীর্ঘকায় ভূপেন: কী—কী হয়েছে?

চন্দননগরে মামাবাড়ি। মামাতো ভাই পুলকের প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন। সৌরাংশুরই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অফিসের জরুরী কাজে কাল সন্ধ্যেতে আচমকা সৌরাংশুকে চলে যেতে হল দিল্লীতে।

তনুশ্রী ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আগে থেকেই পছন্দ করে একটা হার কিনে রাখা হয়েছে, হাতে করে সেটা পৌঁছে দেওয়া যাবে না—এই দুঃখটা তাকে আরো বেশী পীড়ন করতে লাগল। সুতরাং গাড়িটা নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ল সে।

গোল বাধল ফেরার মুখে। শ্রীরামপুর বাজারে এসে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির।

বার কয়েক হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করে তনুশ্রী যখন ঘর্মাক্ত রক্ত-মুখে উঠে দাঁড়াল, তখন চার পাশে বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। এই সমস্ত আধুনিকা মেয়ের গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহসটা যে এমনি একটা পরিণতিতে এসেই থামতে বাধ্য—এই জাতীয় একটা তৃপ্ত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে; জনতার চোখে দেখা যাচ্ছে বিদ্রূপ আর কৌতুকের কটাক্ষ।

তীক্ষ্ণ শীতল দৃষ্টিতে তাকাল তনুশ্রী। সামনে যে লোকগুলো সব চাইতে বেশি হাসাহাসি করছিল, তাদেরই একজনকে কঠিন গলায় সম্ভাষণ করলে সে।

—একজন মোটর মেকানিক ডেকে দিতে পারেন কেউ?

ব্যঙ্গে যারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, তারা এবারে গৌরবে চরিতার্থ হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, এখুনি ডেকে দিচ্ছি—

তনুশ্রী বললে, ধন্যবাদ।

কিন্তু সে কথা শোনবার আগেই তিন-চার জন ছুটোছুটি করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। তনুশ্রী ক্লান্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, তারপর ব্যাগ থেকে যখন রুমালটা বের করতে যাবে, এমন সময়ে ভিড়ের মাথার ওপরে ভূপেনের গম্ভীর গলা শুনতে পাওয়া গেল: কী—কী হয়েছে?

তনুশ্রী চমকে উঠল।

না, ভূপেনকে তখন যে সে চিনতে পারল তা নয়। চারদিকের ক্লেদাক্ত চাপা গুঞ্জনের মধ্যে ওই কণ্ঠস্বরটা এমন গম্ভীর আর সহজ যে, না তাকিয়ে উপায়ই ছিল না। নগণ্য দীনতার ভিড়ের ভেতরে কোথা যেন পুরুষের আবির্ভাব ঘটল। যেন দেখা দিল সেই পুরুষ— যে কাপুরুষতার আক্রমণের ভেতরে নিজের শালপ্রাংশু মহাভুজ বাড়িয়ে দিয়ে উদ্ধার করে বিপন্না নারীকে।

—কী হয়েছে গাড়ির?—তেমনি গম্ভীর সবল গলায় জানতে চাইল ভূপেন।

—এই যে একজন মোটর মেকানিক এসে পড়েছে।—সোল্লাস অভ্যর্থনা জেগে উঠল একটা।

—মোটর মেকানিক?—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভূপেনের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি থমকে গেল তনুশ্রীর। বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় বারো বছর পরে আবার দু'জনে দু'জনের দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইল। ভূপেনের সেই চওড়া আর কোঁকড়া চুল, তনুশ্রীর পাণ্ডুবর্ণ

বিষণ্ণ মুখ আর চিবুকে একটা কালো তিল—ভুল করবার অবকাশ মাত্র দিলে না।

বোবা বিস্ময়ে আর সূচীমুখ আশঙ্কার খোঁচায় যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল তন্নুশ্রী। আর ভূপেনের চোখের ওপর সাদা পর্দার মতো কী একটা ঢুলে উঠল বারকয়েক। কিন্তু ভূপেনই সামলে নিলে আগে। ময়লা হাফ শার্ট আর কালিমাখা পাজামা-পরা মোটর মেকানিক এগিয়ে এসে সহজ গলায় জানতে চাইল: কী হয়েছে আপনার গাড়ির?

আপনার গাড়ির! একবার চমকে উঠেই একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল তন্নুশ্রী। ভূপেন তাহলে চিনতে পারেনি তাকে। বারো বছর! মাত্র দু'বছরের পরিচয় বারো বছরে মুছে যাওয়া এমন কি অস্বাভাবিক ঘটনা? প্রথম প্রেমের স্মৃতি মেয়েদের মনে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে থাকে, কিন্তু পুরুষের বহুবিচিত্র জীবনে তা একটা পুরোনো চিঠির মতোই কোথায় চাপা পড়ে যায় যেন। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ কখনো হাতে ঠেকলে খামটা খুলে দেখারও আগ্রহ জাগে না।

বলিষ্ঠ প্র্যাক্টিক্যাল মানুষের হাতে ভূপেনই গাড়ির বনেটটা খুলে ফেলল: কী হয়েছে?

—স্টার্ট নিচ্ছে না।

কয়েক লহমা তাকিয়েই ভূপেনের অভ্যস্ত দৃষ্টি ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

—পাইপে ময়লা জমেছে আপনার। তেল আসছে না।

—তা হলে?

—পাইপ খুলে পরিষ্কার করতে হবে।

—কতক্ষণ লাগবে?—তন্নুশ্রীও সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

—দু' ঘণ্টা।

—দু' ঘণ্টা!—তন্নুশ্রী আঁতকে উঠল।

—যদি বলেন, দশ-বারো মিনিটের মধ্যে কাজ চালানো গোছের করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে ঠিক সুবিধে হবে না। পথে আবার আচমকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে—তখন হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন।

—তাই তো!—বিব্রত মুখে তনুশ্রী তাকাল।

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে দিতে চেষ্টা করব – ভূপেন আশ্বাস দিলে ঃ আপনি গাড়ীতে উঠে বসুন, আমরা এটাকে আমার কারখানায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

নিরুপায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তনুশ্রী গাড়িতে উঠে বসল। সমস্ত মন আর্তকণ্ঠে বলে উঠতে চাইল, আমি অন্য মেকানিককে দিয়ে গাড়ি ঠিক করে নেব—তোমাকে আমার দরকার নেই। কিন্তু কিছুতেই বলা গেল না সে কথা। কোনো অপরাধ নেই ভূপেনের, মেকানিক হিসেবে তার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোনো পরিচয় এখন পর্যন্ত পায়নি তনুশ্রী। তা ছাড়া একটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসেছে ভূপেন। বাড়িয়ে দিয়েছে তেল-কালিমাখা পেশীবহুল হাত, অনুমতির জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই খুলেছে গাড়ির বনেট। সম্পূর্ণ অপরিচিতের ভূমিকায় এমন একটা সহজ শক্তিতে দেখা দিয়েছে যে, তাকে বাধা দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোথাও।

স্টিয়ারিংটা আলগাভাবে ধরে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল তনুশ্রী। আস্তে আস্তে এগিয়ে ভূপেনের কারখানার সামনে এসে দাঁড়াল।

একটা পেট্রলের গন্ধ-ভরা কালো রুমালে কপাল মুছতে মুছতে ভূপেন এগিয়ে এল। হাসল অপ্রতিভ হাসি।

—দু' ঘণ্টা না হোক, ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবেই। আপনি গাড়িতে বসে থাকবেন এতক্ষণ?

তনুশ্রী হাসতে চেষ্টা করল ঃ কী করব আর?

—কিছু যদি মনে না করেন—ভূপেন আবার লজ্জিত হাসি হাসল ঃ আমার বাড়ি কাছেই। এই দু' পা। আমার স্ত্রী রয়েছেন —ওখানে গিয়েও অপেক্ষা করতে পারেন।

স্ত্রী! তনুশ্রী আবার একটা চমক খেলো। কিন্তু আই-এস-সি ফেল করে মোটর মেকানিক হয়েছে বলেই তার ঘরে স্ত্রী জুটবে না—এমন একটা প্রশ্ন তোলাই তো অসঙ্গত। আজ পাঁচ বছর মাথায় সিঁদুর পরেছে তনুশ্রী, হয়তো তারও আগে সংসার বেঁধেছে ভূপেন। আর—আর কে বলতে পারে তার দেওয়া সেই ছোট আংটিটি ভেঙে স্ত্রীর গলার হারের সঙ্গেই মিশিয়ে দিয়েছে কি না শেষ পর্যন্ত।

—আমি না হয় এখানেই বসি—মৃদু গলায় তনুশ্রী জবাব দিলে।

—মিথ্যে কষ্ট পাবেন। তার চাইতে আমার বাড়িতেই চলুন।

তনুশ্রী আবার চোখ তুলল। সেই গম্ভীর সবল গলা ভূপেনের। কুণ্ঠা নেই তার ভেতর, দীনতা নেই, সংশয়ের জড়তা নেই লেশ-মাত্রও। একটা শক্তিমান পৌরুষ—যে পৌরুষকে সে প্রথম অনুভব করেছিল সরস্বতী পূজোর প্যাণ্ডালে—ইলেকট্রিকের আলোয় চিকচিক করে ওঠা ঘর্মাক্ত পেশল শরীরে।

সে আকর্ষণের আজো কি কিছু অবশিষ্ট আছে ভূপেনের মধ্যে? তনুশ্রী বুঝতে পারল না। কিন্তু রক্ত-কণিকার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পনেরো বছরের কিশোরী অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তনুশ্রী নেমে এল।

—চলুন—

কারখানার পেছনে কাঠা দুয়েক পোড়ো জমির পরেই ভূপেনের বাড়ি। বড় বেশি কাছে, অস্বাভাবিক রকমের কাছে। দূরত্ব এত কম যে, এর মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব কোনো কিছু ভেবে নেওয়া যায় না, পুরুষ ভূপেনের মধ্যে কোনো বর্বরের অস্তিত্ব আছে কি না এবং কোনো একটা রহস্যময় বিভীষিকার মধ্যে টেনে নিয়ে সে চলেছে কি না, এমন কিছু ভেবেও রোমাঞ্চিত হওয়া যায় না। মাঝপথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় দুলবার সময়টুকু পর্যন্ত দিলে না ভূপেন। তার আগেই ঠক-ঠক করে একটা ইঁট-বের-করা একতলা বাড়ির সে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিলে বাইশ-তেইশ বছরের একটি কালো-কোলো বধূ। তারপর তনুশ্রীকে দেখেই পিছিয়ে গেল দু'পা।

ভূপেন বললে, আসুন। গরীবের বাড়ি। কষ্ট আপনার একটু হবেই। কিন্তু গাড়িতে বসে থাকলে বিব্রত হতেন অনেক বেশি।

কালো বউটি ডাগর চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিলে তনুশ্রীর সর্বাঙ্গে, তারপর জিজ্ঞাসু বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাল ভূপেনের দিকে।

সহজভাবেই ভূপেন ব্যাখ্যা করে দিলে: একা গাড়ি নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, মেরামত করতে দেড় দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। মেয়েছেলে কোথায় বসে থাকবেন, তাই নিয়ে এলাম। তুমি ওঁকে একটু চা-টা খাওয়াও রমা, গল্প-টল্প করো।

রমা হাসল: আসুন।

ভূপেন বললে, আমি আর দেরী করব না। দেখি চটপট আপনার গাড়িটাকে সায়েস্তা করে দিতে পারি কি না। ব্যবসায়ীর আয়ত্ত হাসি হাসল ভূপেন, ফিতে-খোলা কাবলী চটিটাকে চটপটিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

রমা বললে, বসুন দিদি—দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?

দিদি! তাকিয়ে দেখল তনুশ্রী। না, এখানেও জিততে পারেনি ভূপেন—জিততে পারেনি তার পৌরুষের জোরে। কালো রঙের গোলগাল একটি বেঁটেখাটো মেয়ে, পানের রসে রাঙানো মুখ। আই-এস্‌-সি ফেল করা ভূপেন বিয়েতেও ফেল্ করেছে, সরস্বতী পূজোর প্যাণ্ডালের সেই বীরের বীরাঙ্গনা আর যেই হোক—এ নয়।

রমা আবার বললে, ঘরের ভেতরে বড্ড গরম। বারান্দার এই চেয়ারটাতেই বসুন। এখানে একটু হাওয়া খেলছে তবু।

—বেশ তো—তনুশ্রী বারান্দায় উঠে এল। খান দুই রঙ-ওঠা ময়লা চেয়ার পড়ে আছে, বসল তারই একটাকে টেনে নিয়ে। চায়ের পেয়ালার গোল গোল দাগ ধরা একটা টিপয়ের ওপরে নামিয়ে রাখল হাতের ব্যাগটা।

—এইবার একটু চা করি আপনার জন্যে?—রমা হাসল। খুব সহজেই হাসতে পারে মেয়েটা—সেই সঙ্গে আশ্চর্যভাবে হেসে ওঠে চোখ দুটো। এইবার মনে হল ঝর্ণার জলে জ্যোৎস্না দুলে ওঠার মতো ওই হাসিটুকুই ভূপেনের কন্‌সোলেশন প্রাইজ, কালো মেঘে ওইটুকুই যা রূপালি-রেখা।

—এত তাড়া কেন? বসুন না একটু গল্প করি—তনুশ্রী অবস্থাটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।

—চা-টা আগে নিয়ে আসি, তার পরে গল্প হবে—চোখেমুখে আবার এক ফালি হাসি বিকীর্ণ করে রমা সামনের ছোট উঠোনটুকু পেরিয়ে আরো ছোট রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এই তবে ভূপেনের সংসার—এইখানেই এসে তা হলে শেষ পর্যন্ত নীড় বেঁধেছে সে। সন্দেহ কী, তাদের বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটের চাইতে এ অনেক খারাপ। দেড়শো টাকা মাইনের বাপের চাইতে ভূপেনের রোজগার অনেক কম। তা না হলে দুখানা টালীর ঘর, দু'হাত বারান্দা আর দশ হাত উঠোনের বারো আনা জোড়া একটা পুঁই মাচা নিয়ে সে খুশী হয়ে আছে কী করে?

দড়িতে গামছার সঙ্গে ঝুলছে ছেঁড়া গেঞ্জী, লুঙ্গি আর ময়লা শাড়ী, একটা ঢাকনা-খোলা বড় টিনের কৌটোয় কয়েক শো বিড়ির টুকরো আর দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি; পায়ের কাছে হিন্দী ছবির গানের বইয়ের গোটাকয়েক ছেঁড়া পাতা; একটা কুলুঙ্গিতে তোলা গোটাকয়েক আধ-ছেঁড়া সিনেমা সাপ্তাহিক; উঠোনের একধারে স্তূপাকার জং-ধরা লোহা-লক্কড় আর টোল-খাওয়া গোটা দুই মাড-গার্ড পুরোনো মোটরের পার্টস্।

এই বাইরের চেহারা—ভেতরের রূপটাও এ থেকেই কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত এইখানেই এসে থেমেছে ভূপেন, তার প্রথম পুরুষ এইখানে এসেই নিজের পুরো হিসেবটা চুকিয়ে দিয়েছে। অথচ! একটা অবাস্তব ভাবনা অকারণে বিদ্যুতের মতো চমকে গেল তনুশ্রীর মনে। সেই পনেরো বছর বয়েসের

প্রতিশ্রুতি যদি আজ পালন করতে হত, পালন করতে হত এই সাতাশ বছর বয়সে? রাত দশটায় হয়তো সর্বাঙ্গে কালি মেখে বাড়ি ঢুকত ভূপেন, ওই ইঁদারার ভাঙা বালতিটা দিয়ে ঝপ-ঝপ করে জল ঢেলে সারা করত স্নান, লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে হুশহাশ শব্দে খেত আধ সের চালের ঠাণ্ডা ভাত, তার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে হিন্দী ছবির গানের বই খুলে শুরু করত সুর ভাঁজতে। আর তনুশ্রী—

ভাবনাটা এই পর্যন্ত এসেই থেমে গেল, আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল শরীর। ভাগ্যিস, পনেরো বছরের প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নেই—ভাগ্যিস বাড়ি বদল করার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেনও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! আরো ভাগ্য যে, ভূপেন আজ তাকে চিনতে পারেনি, না—কোনো মতেই না!

কিন্তু আশ্চর্য! নিজের অগোচরেই একটা বেদনা বোধ করল তনুশ্রী: আশ্চর্য! কী করে ভুলতে পারল ভূপেন, কেমন করে এত সহজেই নির্মূল করে দিতে পারল বারো বছর আগেকার সেই ঘোর-লাগা সন্ধ্যাটাকে! এত সংবেদনহীন পুরুষের মন, এমন সহজেই তার ওপরে জমে ওঠে পলিমাটির স্তর! আর একটু মননময় হওয়া উচিত ছিল ভূপেনের, নীরেট শক্ত শরীরটার ভেতরে মেলে রাখা উচিত ছিল আর একটুখানি ফাঁকা আকাশকে। মোটরের কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে করতে কেন এমনভাবে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে মানুষ—নিজের একান্ত মুহূর্তগুলোর জন্যে কেন এতটুকু নির্জন জায়গা ফেলে রাখতে পারে না?

আংটিটা। কোনো এক অশুভ মুহূর্তে সেই মারাত্মক অভিজ্ঞান নিয়ে দেখা দেবে, তাকে ব্ল্যাক্‌মেল্ করতে চেষ্টা করবে ভূপেন। হঠাৎ এক-একটা ঘুম-ভাঙা রাতে সৌরাংশুর পাশে শুয়ে সে দুর্ভাবনাটা পাথরের মতো তার বুকে চেপে বসেছে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আচমকা জমে গেছে রক্ত, পিপাসায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা। কিন্তু বিস্মৃতির এই নিশ্চিন্ততার চেয়ে

দুঃস্মৃতির সে দুশ্চিন্তা ছিল অনেক ভালো। সে ভয়ের সঙ্গে ছিল উত্তেজনার একটা চঞ্চলতা, ছিল একটা রোমাঞ্চকর আত্মপীড়নের অনন্দ; কিন্তু নির্ভাবনার এই শীতলতা স্পন্দিত আতঙ্কের সেই প্রাণটুকুকে নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে ধরেছে। নিষ্ঠুরতা বই কি! হয়তো সত্যি সত্যিই সেই ভাঙা আংটির কণাগুলো নিজের সমস্ত পরিচয় হারিয়ে, বর্ষার সেই সন্ধ্যাটিকে হারিয়ে ওই কালো বউটার ঘামে ভেজা সরু হারটার সঙ্গে সঙ্গে পেতলের মতো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ উঠে পড়তে ইচ্ছে করল তনুশ্রীর। চলে যেতে ইচ্ছে করল বাড়ির বাইরে। কিন্তু তার আগেই দুহাতে দুটো চায়ের পেয়ালা নিয়ে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এল রমা।

উঠোনটুকু পার হয়ে রমা এগিয়ে আসতে লাগল। তনুশ্রী তাকিয়ে রইল তার চওড়া-পাড় লাল শাড়ীটার দিকে—সীমন্তিনীর স্বামীসৌভাগ্যের প্রতীক। সৌভাগ্যই বটে! এত সহজেই যে ভুলে যেতে পারে, যার জীবনে বিস্মৃতির আবির্ভাব ঘটে এমন হৃদয়হীন অবলীলায়, তার গৃহিণী হতে পারা ভাগ্যবতীর লক্ষণ সন্দেহ কী! কিন্তু আজ যদি হঠাৎ মারা যায় রমা? পেশলদেহ স্থূল-মস্তিষ্ক মোটর-মেকানিক ভূপেন কতদিন বিরহ-বিলাপ করবে তার জন্যে? ছ' মাস—এক বছর? তারপর এই রকম আর একটি কালো-কোলো মেয়ের কপালে সিঁদুর পরিয়ে ভূপেন তাকে ঘরে আনবে, এই বউয়ের হার ভেঙে তার জন্যে নতুন করে চুড়ি গড়িয়ে দেবে। ভূপেনরা এই-ই করে, এই-ই ভূপেনদের নিয়ম।

টিপয়টার ওপরে সস্তার পেয়ালাটা নামিয়ে দিলে রমা। হাতলের নিচে কালো ময়লার রেখা—কালচে চায়ের রঙ। চুমুক দেবার প্রবৃত্তি হয় না।

কাঠের একটা চৌকি টেনে নিয়ে নিজের পেয়ালা হাতে রমা পাশে বসল।

—চা নিন দিদি। দুখানা বিস্কুট দেব?

—না-না, কিছু দরকার নেই। অনেক খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আর কিছুই খেতে পারব না।

রমা চুপ করে রইল। একবার ভীরু-ভীরু চোখে তাকিয়ে নিলে তনুশ্রীর দামী শাড়ীটার দিকে, তার প্রসাধন-মার্জিত পরিচ্ছন্নতার ওপর। যেন ব্যবধানটার পরিমাপ করে নিলে। 'তারপর কী বলতে গিয়েও থেমে গেল—যেন কী বলা উচিত ঠিক করতে পারল না।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে তনুশ্রী পেয়ালাটা নামাল। কপালে মস্ত একটা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ মেয়েটার। সৌভাগ্য—স্বামী-সৌভাগ্য! হঠাৎ ভূপেনের ওপর অর্থহীন ক্রোধে মনটা তিক্ত হয়ে উঠল তনুশ্রীর। এর চাইতে উজ্জ্বল, এর চেয়ে তীক্ষ্ণধার কারো আবির্ভাব কি ভূপেনের জীবনে অসম্ভব ছিল? বলা যায় না—তেমন কেউ এলে হয়তো আরো একটু উর্ধ্বে উঠতে পারত ভূপেন, হয়তো লুঙ্গি পরে সিনেমার গান গাওয়ার চাইতে আরো একটু পরিমার্জিত, পরিশীলিত হওয়া অসাধ্য ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু—

—আপনি কি কলকাতাতেই থাকেন?—রমার দ্বিধাজড়িত জিজ্ঞাসা।

—হুঁ।

—ও।—রমা আবার চুপ করল।

পুঁইমাচার ওপরে একজোড়া চড়ুই পাখি এতক্ষণ তনুশ্রীকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল, এবার সে রমার দিকে ফিরল।

—আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

বাপের বাড়ির প্রশ্নে রমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কথা বলবার মতো সহজ কিছু যেন খুঁজে পেল সে।

—দুর্গাপুরে—বর্ধমান জেলায়।—রমা সাগ্রহে জানতে চাইল: আপনি দুর্গাপুরে গেছেন কখনো?

—না।

—যাবেন একবার। ভারী সুন্দর জায়গা—রমা গর্বিত হয়ে

উঠল : নদী আছে, শালবন আছে। আর ধানের ক্ষেত ! মাঠের পর মাঠ জুড়ে ধান—তার আর শেষ নেই।

—বাঃ—খুব সুন্দর তো !

—হাঁ, খুব সুন্দর। যখন ধান পাকে, কী যে চমৎকার লাগে দেখতে ! কিন্তু এখন তার অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে। সেই যে মিলিটারীরা এসেছিল না আমাদের দিকে ? সব একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। আমাদেরও দেড়শো বিঘে ধানী জমি কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল—এখনো ফেরত পাওয়া যায়নি। তার ওপর পড়ে আছে ওদের ভাঙাচুরো ঘর, লোহালক্কড়, এরোপ্লেনের টুকরো—এই সব।

—ওঃ !—তনুশ্রী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে প্রায়। বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে নামছে উঠোনে। আর কতক্ষণ—কতক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখবে ভূপেন ? এই সংকীর্ণ টালীর ঘরের আরো সংকীর্ণ বারান্দায়—দুর্গাপুরের ধানক্ষেতের মতোই এই শ্যামল সাধারণ মেয়েটার পাশে ?

ঘরের ভেতর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ এল।

—ও কি।—চমকে উঠল তনুশ্রী।

—ছেলেটা।—রমার মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া পড়ল : জ্বরে ভুগছে।

ছেলে ! তা হলে ছেলেও হয়েছে ভূপেনের। সংসারী হওয়ার কোথাও এতটুকু বাকী রাখেনি, নিজের জন্যে এতটুকুও অবশিষ্ট রাখেনি কোথাও।

অকারণে তনুশ্রীর মনটা আবার সংকীর্ণ হয়ে এল : কী জ্বর ?

—কী আর হবে ? ম্যালেরিয়া।

—চলুন দেখি -তনুশ্রী উঠে দাঁড়ল।

—কী আর দেখবেন ?—রমা সংকুচিত হয়ে উঠল : প্রায়ই তো ভুগছে।

—চিকিৎসা হয় না ?

—কুইনিন খায়। উনি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দেন সময় পেলে। ইন্‌জেকশনও দেওয়া হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু

জানেন তো কী পাজী রোগ! একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

—ওর বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে। চলুন, কাছে গিয়ে বসি।

—থাক্ না। জ্বর হলে ওই রকম পড়েই তো থাকে।

কিন্তু তনুশ্রী শুনল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পা বাড়াল।

প্রায় অন্ধকার ঘর, বাইরে থেকে এসে ঢুকলে প্রথমটা কিছুই দেখা যায় না ভালো করে। বিস্বাদ গন্ধে ভরা কেমন একটা দম-আটকানো উত্তাপ। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে যখন ওই উত্তাপ আর গন্ধটা খানিক অভ্যস্ত হয়ে এল, তখন তনুশ্রী দেখতে পেল খাটের ওপর ময়লা কাঁথা জড়িয়ে বছর ছয়েকের একটি শীর্ণ ছেলে জ্বরে ধুঁকছে। কতগুলো বাক্স-তোরঙ্গ, লক্ষ্মীর পট আর কাপড়-চোপড়ে আকীর্ণ ঘরটাকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস কবরের মত মনে হল।

তনুশ্রী আস্তে আস্তে ছেলেটার কপালে হাত রাখল। জ্বরের উত্তাপে ঠাণ্ডা হাতটা যেন জ্বালা করে উঠতে চাইল তার। ছেলেটা একবার চোখ মেলে তাকাতে চাইল, তার পরেই আবার নেতিয়ে পড়ল আচ্ছন্নতার মধ্যে।

- এ যে অনেক জ্বর—তনুশ্রী সভয়ে বললে, তিন টিন হবে বোধ হয়।

—তা হবে—রমা স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলে।

—একটু জলপটি দিলে হয় না?

—দরকার হবে না। বিকেলেই ছেড়ে যাবে।

খাটের একটা কোণায় তনুশ্রী বসে পড়ল। ভূপেনের ছেলে—ভূপেনের স্ত্রী—ভূপেনের সংসার। আঠারো বছরের পুরুষ একটা মোটর মেকানিকের মধ্যে এসে ফুরিয়ে গেছে চিরকালের মতো। অসহ্য ক্রোধে ভূপেনকে ধরে একটা প্রাণপণে ঝাঁকানি দিতে ইচ্ছে করল তার। সমস্ত ভয়, সমস্ত সংশয়ের পালা চুকিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করল : আমি—আমি সেই তনুশ্রী। ভালো করে তাকাও

আমার দিকে, তাকাও আমার সেই পনেরো বছরের কালো গভীর চোখের ওপর। তারপর নতুন করে জীবনের প্যাণ্ডালে পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে তুমি এসে দাঁড়াও। আবার পৃথিবী করতালি দিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করুক, আবার তোমার সবল শরীরে শক্তিমান তারুণ্যের অসীম সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, তোমার গ্রীক-শৌর্যের ওপরে অ্যাপোলোর আশীর্বাদ সৌর কণায় কণায় ঝরে পড়ুক। এই ঘর নয়, এই বুক-চাপা অন্ধকার নয়, এই স্ত্রী আর অসুস্থ সন্তানের গ্লানির মধ্যে নয়—অফুরন্ত প্রাণের উৎসবে হোক তোমার শাপমোচন!

চট্‌পটিয়ে ফিতে-খোলা কাবলী-চটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

—উনি এলেন—রমা বললে ফিস্‌ফিস্ করে।

উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে ভূপেন। তার সবল গম্ভীর স্বর ভেসে এল সেই মৃত-আলোর দেশ থেকে।

—কোথায় গেলেন? গাড়ি তৈরী আপনার।

—তৈরী? -তনুশ্রী উঠে দাঁড়াল বিদ্যুৎবেগে। দম আটকানো অসুস্থ ঘরটা থেকে প্রায় এক লাফে বেরিয়ে এল বাইরে।

ভূপেন হাসল: যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলাম, তার আগেই হয়ে গেল।

—ধন্যবাদ।

—দাঁড়ান—এক মিনিট—ভূপেন পাশের ঘরটায় ঢুকল, বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

-চলুন।

রমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কালো গোলগাল বউ, লাল-পাড় শাড়ী, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। সীমন্তিনী ভাগ্যবতী স্ত্রী। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল তনুশ্রী: আসি ভাই তা হলে। খুব খুশী হয়েছি আলাপ করে। নমস্কার—

—নমস্কার—রমা হাসল. হয়তো বলতে চাইল, আবার আসবেন। কিন্তু বলাটা এত অর্থহীন যে, সেটা বুঝতে পেরেই আর কথা খুঁজে পেল না।

—চলুন—ভূপেন আবার ডাকল।

সেই সংক্ষিপ্ত এতটুকু পথ। কিছু ভাববার আগে, কোনো একটা এলোমেলো কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠবার আগেই তনুশ্রী ভূপেনের কারখানার সামনে এসে দাঁড়াল। ঝকঝক করছে সুন্দর গাড়িটা—মেজে-ঘষে দিব্যি পরিষ্কার করে দিয়েছে ভূপেন।

—দেখে নিন—একবার ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ভূপেন তনুশ্রীকে অনুরোধ জানাল।

গাড়িতে উঠল তনুশ্রী। চাবি খুলে চাপ দিলে স্টার্টারে। আনন্দিত মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে উঠল গাড়িটা—যেন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে এখনি ডানা মেলে দিতে চায়।

—কত দেব আপনাকে?—আরক্ত মুখে অবরুদ্ধ স্বরে জানতে চাইল তনুশ্রী।

ভূপেন স্বচ্ছ হাসি হাসল: কত আর দেবেন? বেশী কিছু করতে হয়নি, গোটা পাঁচেক দিলেই হবে।

কাঁপা হাতে ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট ভূপেনের দিকে বাড়িয়ে দিলে সে। ভূপেন সেটা অভ্যস্ত পরীক্ষকের মতো আলোর দিকে তুলে দেখে নিলে একবার।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ—এতক্ষণে যেন মুক্তির নিশ্বাস পড়ল তনুশ্রীর। যেন পালিয়ে বাঁচল একটা অপমৃত্যুর শ্মশান থেকে। তবু—তবু! আঠারো বছরের প্রথম পুরুষ মরে গেছে তার, আশঙ্কা আর উত্তেজনায় তার নিভৃত সঞ্চয়কে আজ সে চিরকালের মতো ভূপেনের চিতাভস্মের সঙ্গে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল!

তনুশ্রীর কান্না আসতে লাগল। আজ যেন তার একটা গোপন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেল—যেন ফাঁকা হয়ে গেল সব। চলন্ত মোটরের অপর্যাপ্ত হাওয়াতেও এখনো সে ভালো করে নিশ্বাস নিতে পারছে না, সেই বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ উত্তাপটা এখনো তার হৃৎপিণ্ডে চেপে বসে আছে। এত দিন পরে যেন সে রিক্ত হয়ে গেছে!

হঠাৎ পায়ের কাছে নীল কাগজে মোড়া একটা ছোট জিনিস চোখে পড়ল। কী ওটা? কখন এল? তীক্ষ্ণ সন্দেহে সেটাকে তুলে নিতেই তার কোলের ওপর গড়িয়ে পড়ল একটা চকচকে ছোট জিনিস। বিবর্ণ মিনার আংটি। 'তনুশ্রী'—হরফ ক'টা এখনো স্পষ্ট পড়তে পারা যায়।

স্টিয়ারিঙের ওপর মুঠো শক্ত হয়ে এল—বিহ্বল হয়ে এল দৃষ্টি। সবটাই তাহলে ভূপেনের অভিনয়—আশ্চর্য নিপুণ অভিনয়। ইচ্ছে করেই ভূপেন তাকে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তার স্ত্রীর সঙ্গে, দেখিয়েছে মোটর মেকানিকের জীর্ণ অন্ধকার সংসারের রূপ! সেই জন্যেই পাঁচ টাকার নোটটাকে অমনভাবে আলোয় তুলে পরীক্ষা করে করে দেখেছে সে।

আঘাত! আঘাত দিয়েছে ভূপেন। আঘাত দিয়েছে দীনতার আভিজাত্যে। আজ তনুশ্রীর আর তাকে ভয় নেই, তনুশ্রীরাই তার ভয়। আজ নিজের গণ্ডীর ভেতর থেকে তনুশ্রীদের সে নির্বাসিত করে দিতে চায়। যার কাছ থেকে সে পালাতে চাইছিল, সে-ই তার কাছে পলাতক! ওই আংটিটা ফিরিয়ে দেওয়া তনুশ্রীর ভয়মোচন নয়, তার নিজেরই দায়মোচন।

ইচ্ছে করল গাড়ি ঘুরিয়ে সে ফিরে যায় -ড্যাশ করে ভূপেনের কারখানার ওপর গাড়িটাকে চুরমার করে দেয়। কিন্তু তা করল না তনুশ্রী। আংটিটাকেই সে সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তারই গাড়ির চাকায় চেপটে গিয়ে ছোট আংটিটা একরাশ পিচের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মর্যাদা

ফট্ করে স্যাণ্ডালের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। বিপন্নভাবে এদিক ওদিক তাকাতে দেখি ও-ধারের ফুটপাথ দিয়ে মুচি চলেছে যন্ত্রপাতি নিয়ে। ডাকলাম, মুচি, এই মুচি—

সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে কমলা আমার হাত চেপে ধরল।

—এই, কী হচ্ছে?

—কী আর হবে? মুচিকে ডাকছি।

—তাই বলে অমনিভাবে? ওর কি একটা নাম থাকতে নেই?

বললাম, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কলকাতার হাজার কয়েক মুচির নাম আমি মুখস্থ করে রেখেছি—আমার সম্বন্ধে এ-রকম উচ্চাঙ্গের ধারণা তোমার জন্মাল কী করে?

—কিন্তু অন্তত ওকে বুট-পালিশ বলেও তো ডাকতে পারতে।

—তাতে কি ওর পদমর্যাদা বাড়ত নাকি?

—কী জানি, ঠিক বলতে পারব না। -কমলা একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল: কিন্তু ওই মুচি ডাকটার সঙ্গে আমার এমন অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা জড়িয়ে রয়েছে—

কমলা থামল। বুট-পালিশ ততক্ষণে রাস্তা পার হয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে।

মনুমেণ্ট পার হয়ে একটা ঘাসের জমির ওপর আমরা এসে বসলাম। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের বেষ্টনী নেমেছে আমাদের ঘিরে। বসন্তের উতরোল হাওয়া মাতামাতি করছে। সামনে বহুবর্ণ নিয়নের দীপালী।

পা দুটো সামনে ছড়িয়ে একদিকের হাতের উপর একটুখানি ভর দিয়ে কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বসে ছিল কমলা। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অভিজ্ঞতার কথা যেন কী বলছিলে?

কমলা হাসল, সেই কথাটাই ভাবছিলাম। আচ্ছা, আমাদের কলেজ-হোস্টেলের কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে?

বললাম, এত সহজেই ভুলব? ওখানকার ভিজিটার্স রুমে বহু দিনই আমায় কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে।

—আর সামনের ফুটপাথটা?

—তীর্থের কাকের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেছি দিনের পর দিন।

—ডাক্তারী দোকানটাকে মনে আছে?

—বিলক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ধরে গেলে অ্যাসপিরিন কিনতাম ওখান থেকে।

কমলা ধমক দিয়ে বললে, থাক, আর চালাকি করতে হবে না। ওই দোকানের সামনে রোজ সকাল-বিকেলে অল্পবয়সী একজন মুচি বসত, দেখেছ কোনোদিন?

—লক্ষ্য করিনি। চোখটা ওপর দিকেই থাকত।

—সে আমি জানি। কমলা হাসল, ঠিক ওপরেই দোতলার ঘরে আমি থাকতাম। আর জুতো সারানোর দরকার পড়লেই আমি ডাকতাম, এই শোনো—শোনো?—সঙ্গে সঙ্গে ও ওর তল্পিতল্পা নিয়ে হোস্টেলের গেটের ভেতরে চলে আসত। শেষে আমরা আর নীচেও নামতাম না, ও-ই দোতালায় এসে আমাদের জুতো নিয়ে চলে যেত।

ছোকরার বয়েস আঠার-উনিশের বেশী নয়। এক-মাথা কোঁকড়া চুল—শামলা গায়ের রঙ, হাসিতে ঝক্‌ঝক্ করত চোখ। চটপট্ কাজ করত, পয়সাও বেশী নিত না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, আমার সম্পর্কে ওর মনে একটা পক্ষপাত গড়ে উঠেছে। সকলের আগে আমার জুতোগুলো সারিয়ে দিয়ে যায়। পাঁচ-সাতজন মিলে কলেজে চলেছি, হঠাৎ

আমাকে ডেকে বলে, একটু দাঁড়িয়ে যান দিদিমণি। জুতোটা ময়লা হয়ে গেছে—কালি করে দিই।

বললাম, পক্ষপাতটা ওর পক্ষে অন্যায়, এ-কথা আমি বলতে পারব না। শুধু হোস্টেলেই নয়, তুমি তখন কলেজেও কুইন ছিলে কমলা! কত প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে থেকে তোমাকে যে আমার জয় করে আনতে হয়েছে—সে-দুঃখের কথা কেবল আমিই জানি।

কমলা ভ্রুকুটি করল, নিজেই বকবক করবে, না বলতে দেবে আমাকে?

—একটি সুন্দরী মেয়ের মনোহরণ করার দুশ্চর সাধনার কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা, আর বাধা দেব না। বলে যাও।

কমলা বলে চলল, ঠাট্টা অবশ্য বন্ধুরাও আমাকে করত। বলত, পুরুষ হলে তোকে নিয়ে পালিয়ে যেতাম কমলা। বেচারা মুচির আর দোষ কী—অমন দুখানি রাঙা পা থাকতে আমাদের পায়ের কথা ওর মনে পড়বে কেন?

—কিন্তু সেন্স অব হিউমার সকলের সমান নয়। শেষ পর্যন্ত একদিন চেঁচামেচি শুরু করে দিলে ফোর্থ ইয়ারের সুচারুদি। চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

আমাকে দেখেই সুচারুদি বললে, এই যে কমল। কাল তোর জুতোয় হাফ সোল করে দিতে কত নিয়েছিল রে?

বললাম, 'বারো আনা।' বলেই অনুতাপ হল আমার। তাকিয়ে দেখলাম, মুচি কেমন একটা করুণ দৃষ্টি মেলে রেখেছে আমার দিকে। যেন বলতে চাইছে, তুমি তো এদের সকলের দলে নও—তোমার সঙ্গে কার তুলনা চলে?

উত্তেজিত হয়ে সুচারুদি বললে, তবে? আমার কাছে তা হলে পাঁচসিকে চায় কেন? কেন বলছে, এক পয়সাও কম নেব না?

মুচি ভাঙা-ভাঙা বাংলায় কৈফিয়ত দিতে চাইল, আপনার জুতো অনেক বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছিল দিদিমণি—

কিন্তু ইকনমিক্সে অনার্স পড়া সুচারুদিকে অত সহজেই ফাঁকি

দেওয়া যায় না। চেরা গলায় সুচারুদি চিৎকার করে উঠল, ইয়ার্কি পেয়েছিস? অনেক বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কমলের অন্তত ছ'মাস পরে জুতোটা কিনেছি আমি!

মুচি বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল, সব জুতোর চামড়া সমান হয় না, কিন্তু সুচারুদি ওকে থামিয়ে দিলে। বললে, হয়েছে, আর বলতে হবে না। বুঝেছি। এক টাকার একটা নোট মুচির প্রায় মুখের ওপর ছুঁড়ে দিলে সুচারুদি: এই একটা টাকার বেশি এক পয়সাও দেব না তোকে। এর পরে জুতোও সারাতে দেব না কোনোদিন।

নোটটা নিয়ে ম্লান মুখে মুচি নেমে গেল।

ব্যাপারটা ওইখানেই থামল না। সুচারুদি আবার কথাটা তুলল খাওয়ার ঘরে এসে।

একজন বললে, তুই মিথ্যেই হিংসেয় জ্বলে মরছিস সুচারু। সুন্দর মুখের জিত সব জায়গায়।

আর একজন বললে, সুন্দর পায়েরও।

তৃতীয় একটি মেয়ে আরো রসান দিয়ে বললে, আমি যদি মুচি হয়ে জন্মাতাম তা হলে ওর পায়ের জুতো বিনা পয়সাতেই সারিয়ে দিতাম। এ তো তবু বারো আনা নিয়েছে।

নিরীহ নির্দোষ হিউমার। কিন্তু আমি যেমন লজ্জা পেলাম, রাগও হল। সুচারুদির জুতোজোড়া আমিও দেখেছি। আমার জুতো সারাতে বারো আনা দিতে হলে ওর ক্ষেত্রে পাঁচ সিকে দেবার মত কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই।

ভাবলাম, মুচিকে এ নিয়ে একটু বকুনি দেব। কিন্তু তাতেও লজ্জা হল। তা ছাড়া সত্যি বলতে কি, একটু চাপা অহঙ্কারও যে না হয়েছিল তা নয়। হোক মুচি, তবু সে যে আমাকে একটুখানি আলাদা করে দেখে, আমাকে মনে মনে একটুখানি পুজো করে, এ কথা ভেবে খুশীই হয়েছিলাম।

লোকটাও দিন কয়েক যেন একটু সংকুচিত হয়ে রইল। যখন কলেজে যেতাম দল বেঁধে, তখন লক্ষ্য করতাম, ও প্রায়ই আড়চোখে

আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন বলতে চায়, দিদিমণি, আপনার জুতো ময়লা হয়ে গেছে একটু কালি করে দিই। মনে মনে কথাটা বলত নিশ্চয়ই, কিন্তু মুখ ফুটে আর উচ্চারণ করত না।

এর মধ্যে একদিন বিকেলে একা বেরুচ্ছি, হঠাৎ জুতোয় একটা পেরেক উঠল। ওর সামনে গিয়ে বললাম, লোহাটা ঠুকে দাও তো।

জুতোটা হাতে নিয়ে ও একবার বিব্রতভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল, পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিলে। তারপর অন্যমনস্কভাবে ফিতেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবে ?

ফস করে ও বলে বসল, দিদিমণি, আপনাদের পূজোর ছুটি হবে কবে ?

কেন, বলো তো ?

আবার চোখ তুলেই ও নামিয়ে ফেলল, তখন কি আপনি বোর্ডিঙে থাকবেন ? না দেশে যাবেন ?

বললাম, পুরীতে বেড়াতে যাব।

ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পুরী ? যেখানে জগন্নাথের মন্দির আছে ?

—হাঁ, সেইখানেই।

ও এবার আমার মুখের দিকে সোজা চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

—তুমি ?

—হুঁ, আমিও বেড়িয়ে আসব। পুরীতে যেতে-আসতে রেলে কত ভাড়া লাগে দিদিমণি ?—

—কী জানি, টাকা কুড়ি হবে বোধ হয়।

—কুড়ি টাকা! কয়েক মুহূর্তের জন্যে ও চুপ করে রইল। তারপর বললে, পূজোর ছুটির আর কত দেরি আছে ?

—প্রায় দেড় মাস।

—দেড় মাস? তবে ঠিক হয়ে যাবে—এই বলে পরমোৎসাহে ও আমার জুতোর পেরেক ঠুকতে লাগল।

—কী ঠিক হয়ে যাবে?—আমি কৌতূহল চাপতে পারলাম না।

—ভাড়ার টাকা। এর মধ্যে ঠিক জমিয়ে ফেলব।

—আমার হাসি পেল। জুতোটা ঠোকা হয়ে গিয়েছিল, আমি ওকে দুটো পয়সা দিতে গেলাম। ও মাথা নেড়ে বললে, না—না! দুটো ঘা দেওয়া মোটে, এর জন্যে পয়সা দিতে হবে না।

আমি কৌতুক বোধ করে বললাম, এমনি করেই কি তুমি পুরী যাওয়ার টাকা জমাবে?

ওর চোখদুটো তেমনি জ্বলজ্বল করতে লাগল: সে ঠিক হয়ে যাবে আপনি দেখবেন।

কথাটা তারপরে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু দিন সাতেক পরে আবার যখন একা বেরিয়েছি তখন আমাকে ও পেছন থেকে ডাকল।

—দিদিমণি?

—কী বলছিলে?

—তিন টাকা জমেছে।

—কিসের তিন টাকা? জিজ্ঞেস করেই আমার মনে পড়ে গেল। হেসে বললাম, তা হলে সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে পুরী যাবে দেখছি।

—নিশ্চয়ই যাব। জোরালো গলায় জবাব এল।

তোমার সঙ্গে সেদিন সিনেমা হাউসের সামনে দেখা হওয়ার কথা—সিনেমা দেখব দু'জনে। কাজেই তখন আর দাঁড়ালাম না। কিন্তু তারপর থেকে প্রায়ই ওকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করতাম, কত জমল?

ঠাট্টা বুঝত না। উদ্দীপ্ত মুখে বলত, 'পাঁচ টাকা।' আরো পরে বলত, 'সাড়ে ছ' টাকা।'

তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে, পনেরো দিনের ভেতরেই ও প্রায় দশ টাকা জমিয়ে ফেলল। শুধু তাই নয়, ওর সাজ-পোষাকেরও যেন বদল হচ্ছিল ধীরে-ধীরে। লক্ষ্য করলাম, আধ-ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জির বদলে ওর গায়ে একটা নতুন ছিটের শার্ট, ধুতিটার রঙ যেন একটু বেশিমাত্রায় ফর্সা।

ছন্দ পতন ঘটল এই দশ টাকার ঘরে এসেই।

পর পর কয়েকদিন ভারী বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিন জোড়া জুতোই ভিজে একাকার। কলেজে বেরুবার মুখে চটিটা পায়ে গলাতে গিয়ে দেখি, সেটারও ফিতে ছেঁড়া। দোতলা থেকে নামাই অসম্ভব।

জানলা দিয়ে দেখলাম তিনদিন পরে ও-ও এসে জায়গাটিতে বসেছে। এ কদিন অন্য কোথাও কোনো গাড়ি-বারান্দার নিচে আশ্রয় নিয়েছিল খুব সম্ভব। এখানে বসতে পারেনি বটে, কিন্তু কুড়ি টাকার টার্গেটের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি।

কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। আমি জানলা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ডাকলাম : মুচি—মুচি—এই মুচি।

ও হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। একবারের জন্যে তাকিয়ে দেখল আমার দিকে। পরক্ষণেই যেন শুনতেই পায়নি, এমনিভাবে মাথা নিচু করে হাতের কাজটা করে যেতে লাগল।

আমি আবার ডাকলাম, মুচি, শোনো– শোনো—

মাথা নামিয়েই ও জবাব দিলে, চাকরকে দিয়ে জুতো নিচে পাঠিয়ে দিন, আমি এখন যেতে পারব না।

জিনিসটা খুব নতুন রকমের মনে হল। কিন্তু তখন আমার ভারী তাড়া, আশ্চর্য হওয়ার সময়ও ছিল না।

চাকর দিয়েই জুতোটা পাঠিয়ে দিলাম। আর বলে দিলাম, পাঁচ মিনিটেই চাই। কিন্তু পাঁচ মিনিট তো দূরের কথা, পনেরো মিনিটেও জুতো এল না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, মুচির সেখানে চিহ্নও নেই। সে যে কখন উধাও হয়েছে কে জানে! এ কি কাণ্ড!

বন্ধুরা বললে, এতদিন পরে শেষে এক জোড়া চটি নিয়ে পালাল! তা-ও ছেঁড়া পুরোনো চটি। আমরা তো ভেবেছিলাম, ও তোকে নিয়েই পালাবে!

আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না।

চটি অবশ্য খোয়া গেল না। কিন্তু ফেরত এল দু-দিন পরে। একটা দশ বারো বছরের ছোকরার হাতে। কিছুই সারায়নি। যেমনটি নিয়ে গিয়েছিল তেমনই ফেরত পাঠিয়েছে।

ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলুম, এ চটি যে নিয়ে গিয়েছিল, সে কোথায়?

ছোকরা জবাব দিলে, সে আর কলকাতায় কাজ করবে না। আজ সকালে সে দেশে চলে গেছে।

কিন্তু কেন চলে গেল? এ-প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি। আমি ওকে 'মুচি—মুচি' বলে ডেকেছিলাম তাই? ও কি আমার কাছ থেকে আরো কিছু বেশী আশা করেছিল? ও কি ভেবেছিল, ওর মধ্যে থেকে আমি আরো কোনো বড় পরিচয়কে আবিষ্কার করব?

কমলা থামল। আবিষ্ট চোখ মেলে চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

ওর চশমার কাচের ওপর নিয়নের নানা রঙের আলো একরাশ এলোমেলো ভাবনার মত চিকচিক করতে লাগল।

নেতার জন্ম

নাউ হি ইজ্ এ গ্রেট লীডার। তোমরা কাগজে ওঁর ছবি দেখতে পাও। শুনতে পাও বক্তৃতা। দেশের স্টার্ভিং মিলিয়নের জন্য উনি সংগ্রাম করছেন। অবশ্য তোমাদের ভেতরে একদল রয়েছে, যারা ওকে রাইটিস্ট আখ্যা দেবে। বলবে ওঁর রাজনীতি শুধু ক্ষমতা লাভের জন্য; বলবে, একবার যদি উনি মন্ত্রীত্বের গদীতে বসতে পারেন তাহলে দেশের জন্যে ওঁর যা কিছু সহানুভূতি আর সমবেদনা, মুহূর্তের মধ্যে তা মিলিয়ে যাবে কর্পূরের মতো। ইট্স্ অ্যান ইলেক্শন স্টান্ট। মরুক গে, তোমাদের রাজনীতি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই বিন্দুমাত্র। কিন্তু এটাতো স্বীকার করবে যে হি ইজ এ ম্যান অব্ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্স! ভগবান না করুন, আজ যদি ওঁর ভালোমন্দ কিছু একটা হয়, তা হলে কাগজে অন্তত দেড় কলম জুড়ে বেরুবে অশ্রুকাতর শোক-সংবাদ।

ইয়েস! তোমরা স্বীকার করো বা না করো, হি ইজ্ এ গ্রেট লীডার। অল্ ইণ্ডিয়া ফেম্। এ ম্যান্ ইন্ এ মিলিয়ান্। অ্যাণ্ড্—অ্যাণ্ড্ ফাইটিং ফর্ দি মিলিয়ান্।

আমি জানতাম। জানতাম এ হতেই হবে। ওঁর যখন জন্ম হয়, তখন আমিই অ্যাটেণ্ড্ করেছিলাম ওঁকে। এখন আমার বয়স ষাট। সে প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে।

তোমাদের রিভোলিউশন্ কী বলে? রক্তপদ্মের আসনে নেতার অধিষ্ঠান হয় না। তার সাধনা সহস্র মানুষের শবশয্যায়, তার প্রতিষ্ঠা লক্ষ ছিন্নমুণ্ডের তান্ত্রিক আসনে। একালের নেতার জীবনে জীবন

লাভ করে সমগ্র দেশ জেগে ওঠে না, সমস্ত দেশের জীবন তিলে তিলে হরণ করে নিয়ে অধিনায়কের জীবন দীর্ঘরচিত হয়।

এ সত্য আমি বুঝেছিলাম ওঁর জন্মের সময়। বুঝেছিলাম হি ইজ ডুম্‌ড টু বি এ লীডার। ওঁর জন্মলগ্নেই ভবিষ্যৎ তার ছায়া ফেলেছিল, একটি মৃত্যুর রক্ত দিয়ে আমিই ওঁর কপালে এঁকে দিয়েছিলাম নেতৃত্বের রাজটীকা। হ্যাঁ, আমিই!

প্রথম জীবনে, কিছু কিছু ভাবপ্রবণতা যখন ছিল, তখন মাঝে মাঝে রাত্রে আমার ঘুম আসত না। অন্ধকার ঘরে ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ একটা অর্থহীন বিভীষিকায় আমার সমস্ত স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করে আনত। মনে হত, মুমূর্ষু একটি নবজাত শিশুর বুকের স্পন্দন আমি শুনতে পাচ্ছি—তার প্রতিটি অনুরণন এক একটা বুলেটের মতো আঘাত করত আমার মধ্যে।

হেঁয়ালি ঠেকছে? আচ্ছা, ঘটনাটা তাহলে বলি।

বয়েস অল্প, সবে ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছি। মাথার মধ্যে তখন স্বদেশী করবার খেয়াল জেগে আছে। ছাট ইটার্নাল্ ইডিয়সি অব্ ইটার্নাল্ ইয়ুথ্।

যিনি আমাদের গাইনোকলোজী পড়াতেন, তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে। পড়াতে পড়াতে কখনো কখনো তাঁর গলায় যে সুরটা বেজে উঠত, তা আর যাই হোক ডাক্তারী ক্লাশের উপযুক্ত নয়! অত্যন্ত স্থূল বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ যেন তাঁর চোখে স্বপ্নালু আবেশ ঘনিয়ে আসত। মনে হত, মুহূর্তের জন্য আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে অপসৃত হয়ে গেছেন তিনি।

বলতেন, তোমরা ডাক্তার হতে চলেছ। কিন্তু মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড্‌স,—তোমাদের শিক্ষাকে তোমরা প্রোফেশন করে নিয়ো না, মেক্ ইট্ এ মিশন্। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে যারা শুধু শুষতেই এসেছে তাদের ওপরেই কোটি কোটি মানুষের ভার ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ো না। তোমরা গ্রামে গ্রামে যাও—যে অস্ত্র

আজ হাতে পেয়েছ তাই নিয়ে লড়াই করো আধি-ব্যাধি-মৃত্যুর সঙ্গে। সেবকের ব্রত গ্রহণ করো। সার্ভ অ্যাণ্ড্ সেভ্ ইয়োর্ কান্ট্রি।

ওই এক বিশেষত্ব ছিল সেকালের বুড়োদের। আজকালকার মতো সংযত, বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় কথা বলতে জানত না তাঁরা। ইমোশনের বন্যায় ভেসে যেত, জলের কণা জমে উঠত চোখের কোণায় কোণায়। মানুষকে অভিভূত করে ফেলবার অদ্ভুত মন্ত্র যেন আয়ত্ত ছিল তাদের। থ্যাঙ্ক্ হেভেন্স্, সে রোমান্সের যুগ তোমরা পার হয়ে এসেছ।

কিন্তু ওই কথাগুলো তখন ক্রিয়া করেছিল আমাদের চেতনার মধ্যে। পাশ করে বেরুবার পরেও তাঁর সেই অশ্রু-করুণ চোখদুটিকে আমরা অনেকেই ভুলতে পারিনি। তাই মেডিক্যাল্ কলেজের গেট থেকে বেরিয়েই সোজা পা চালিয়ে দিলাম গ্রামের উদ্দেশে।

বাবা মারা গিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, তাই শাসন করবার কেউ ছিল না। দু-একজন শুভানুধ্যায়ী অবশ্য শহরে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করবার সদুপদেশ দিতে এসেছিলেন, কিন্তু দেশপ্রেমের তোড়ে মুহূর্তে তাঁদের ভাসিয়ে দিলাম। তারপর লেগে গেলাম কাজে: সার্ভ এণ্ড সেভ্ দি কান্ট্রি।

আদর্শের ফাঁপা বেলুনে চড়ে যারা আকাশে উড়তে ভালোবাসে, তাদের জন্য কাজের অফুরন্ত সুযোগ বই কি। কালিদাস ঋতুসংহার লিখেছেন, কিন্তু ঋতুর সংহার মূর্তিগুলো যদি সত্যি সত্যিই চোখে দেখতে পেতেন, তা হলে আর যাই হোক কাব্যরচনার ভণ্ডামিটা সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। ছটি ঋতু বাংলার গ্রামে গ্রামে নানা রঙের ডালি সাজিয়ে আনে না, আনে এক-একটি করে এপিডেমিক্। হুক্‌ওয়ার্ম থেকে শুরু করে টি-বি পর্যন্ত সবাই মানুষের কাঁধে হাত রেখে পাশাপাশি হেঁটে চলে দিনের পর দিন। এখানে ওখানে থাবা পেতে বসে আছে হাতুড়ের দল, টিপসই-করা কবিরাজ আর বানান করে বই পড়া হোমিওপ্যাথ্। কাজ আর কিছুই নয়, যৎকিঞ্চিৎ পারানির পয়সা গুণে নিয়ে লোকগুলোকে পরলোকের পাস্‌পোর্ট বিতরণ করা।

আমি ভাবলাম, দেশকে এবারে নীরোগ করে ছাড়ব।

কিন্তু হাওয়াই বেলুনটা ফেঁসে যেতে সময়.লাগল না বেশীদিন।

শুধু সদিচ্ছা থাকলেই তো যথেষ্ট হয় না। ওষুধ চাই, ইকুইপমেন্ট্‌স দরকার! যে ইন্‌জেকশন্‌টা এই মুহূর্তে প্রয়োজন.তা আনতে গেলে লোক পাঠাতে হবে তিরিশ মাইল দূরের শহরে, ফিরতে সময় লাগবে দু' দিন। ততক্ষণ হয়তো পেশেন্টের চিতার কাঠ অবধি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তা ছাড়া কাঁহাতক আর ভালো লাগে এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো? আদর্শ-বিলাসেরও একটা সীমা আছে, মহৎ হতে চাইলেই মহামানব হওয়া যায় না। প্রথমে এল হতাশা, তারপরে ক্লান্তি, তারপর বিরক্তি। তারও পরে মনে হতে লাগল, দেশের জন্যে আর যদি কারো মাথাব্যথা না থাকে, তাহলে, হোয়াই আই অ্যাম গোয়িং টু বি দি ওন্‌লি ভিক্‌টিম? এর চাইতে শহর ঢের ভালো। সেখানে অন্তত বৈচিত্র্যের আস্বাদ আছে, একটা জীবনের উত্তাপ আছে। এমন করে মৃত পৃথিবীর একটা তুষারশীতল স্পর্শ সেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে দেহমনকে অসাড় আর আড়ষ্ট করে আনে না!

তাছাড়া তখন টাকার স্বাদ পেতে শুরু করেছি একটু একটু করে। অদ্ভুত জিনিস এই টাকা! যতদিন তুমি তাকে চাইবে না, ততদিন সে বারে বারে মোহিনী অপ্সরীর রূপ ধরে ধ্যান ভঙ্গ করতে আসবে তোমার কাছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার যোগভঙ্গ হবে, তখনি দেখবে সে আর কোথাও নেই! সোনার হরিণের মতো ঝলক লাগিয়েই সরে যাবে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে।

এনিওয়ে, যা বলছিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই এমন দু'চারটি পেশেন্টের সন্ধান মিলল, যাঁরা জোর করে টাকা দিতে আরম্ভ করলেন। বোধ করি চাষা আর ভদ্রলোকের বিনামূল্যে চিকিৎসার সাম্যবাদটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারতেন না, প্রেস্টিজে বাধত। টাকা দিতে তাঁরা শুরু করলেন ওই লাইন অব্‌ ডিমার্কেশনটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই। এই কলকাতা শহরেই আট টাকা আর

চৌষট্টি টাকার ব্যবধানটা সৃষ্টি হয়েছে ডাক্তারের প্রয়োজনের জন্যে নয়, রোগীর প্রেষ্টিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে।

এদেরই একজন—রামদাস মুখুয্যে ছিলেন আমাদের পাশের গ্রামের তালুকদার। ছোটখাটো জমিদারই বলা উচিত তাঁকে। তাঁর কাছারি বাড়িতে দু'তিনটে হিন্দুস্থানী দারোয়ান সিদ্ধি ঘুঁটত, হাতিতে চড়ে মহাল দেখতে বেরুতেন রামদাস।

একদিন তাঁর ওখান থেকে লোক এল। জরুরী দরকার, এক্ষুণি যেতে হবে।

গেলাম।

রামদাসবাবু সাগ্রহে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন, আসুন। আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

—কী ব্যাপার বলুন তো ?

—আমার স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা—

—পেন্ উঠেছে নাকি ?

—এখনো ওঠেনি, তবে মনে হচ্ছে আর দু-চারদিনের বেশি দেরী হবে না। ফার্স্ট কন্ফাইনমেন্ট্, তাই বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি। তা ছাড়া আমার প্রথম সন্তান, বুঝতেই পারছেন—আনন্দে আর গৌরবে বোকার মতো দাঁত বের করে হাসলেন রামদাসবাবু।

পরীক্ষা করলাম পেশেন্ট্‌কে। যৎপরোনাস্তি নর্মাল। ফিটাসের মাথা নিচের দিকে নেমে এসেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ডেলিভারী হবে আর হবে দু' একদিনের মধ্যেই। সফ্‌ট ফ্লেক্সিব্‌ল পেল্‌ভিক বোন—কোনো অসুবিধে হবে বলে মনে হল না।

বললাম, কিছু ভাববেন না, বললাম সব ঠিক আছে। ফার্স্ট ডেলিভারী হলেও বিশেষ কোন কষ্ট পাবেন বলে মনে হয় না। আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণই নেই।

রামদাসবাবু বললেন, কী জানি মশাই, কিছুতেই ভরসা পাচ্ছি না। একে প্রথম পোয়াতী—তার ওপর প্রথম সন্তান, রাতে আমার ঘুম হয় না মশাই। এলোমেলো সব দুঃস্বপ্ন দেখি।—হঠাৎ গলার পৈতে

দিয়ে তিনি আমার দুহাত জড়িয়ে ধরলেন, দোহাই ডাক্তারবাবু, সব দায়িত্ব আমি আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ডেলিভারী করিয়ে যাবেন। টাকা আপনি যা চান তাই পাবেন। আমার এই প্রথম সন্তান—রামদাস কাঁদবার উপক্রম করলেন।

দুনিয়ায় অমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু একটা পুরুষমানুষকে ওভাবে কাঁদতে দেখলে যেন একটা 'নশিয়া' বোধ হয়, গা বমি বমি করতে থাকে। তখনকার মতো রেহাই পাওয়ার জন্যে অগত্যা বলতে হল, আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে।

—একটু দাঁড়ান—

বলে, রামদাসবাবু ভেতরে চলে গেলেন, ফিরে এলেন একতাড়া নোট নিয়ে। একশো টাকা। জোর করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, এই আগাম দেওয়া রইল। যদি ভালোয় ভালোয় আমাকে এ যাত্রা উদ্ধার করে দিতে পারেন, তা হলে আরো একশো টাকা আপনার পাওনা রইল।

চড়া রোদে মাঠের মধ্যে দিয়ে সাইকেলে করে যখন ফিরছিলাম, তখন সেইদিন একটা কথা প্রথম আমার মনে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, হাউ লাকি দোজ ক্যালকাটা ডক্টরস্ আর! তাদের গাড়ি আছে, আমার মতো কাঠফাটা রোদে তাদের মাঠের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় না।

অ্যাণ্ড্ ফ্রম দ্যাট্ ডে, আই স্টার্টেড্ টু হেট্ মাই কান্ট্রি।

আসল ব্যাপারটা ঘটল এরই দিন তিনেক পরে।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা এক কাপ চা নিয়ে সবে বসেছি, এমন সময় এক ভগ্নদূত এল।

—একবার গেলে বড় ভালো হত ডাক্তারবাবু।

—আর সময় পেলে না মরবার? —আমি খিঁচিয়ে উঠলাম। এ জিনিসটা নতুন আয়ত্ত করেছি—আগে এমন করে কাউকে খিঁচোতে পারতাম না।

—কী করব, বড় বিপদ -লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে গেল।

—বড় বিপদ? কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে তুমি এক্ষুণি খাটিয়াঁয় চড়বে—আরো বিশ্রী গলায় আমি জেরা করতে শুরু করে দিলাম।

—আজ্ঞে না, আমার নয়। আমাদের গাঁয়ের একটি মেয়েছেলে—

—মেয়েছেলে? তাই বুঝি পরোপকারের জন্য এত বেশী উৎসাহ তোমার?

কিন্তু নীরেট গ্রাম্য লোক, তাই আমার রসিকতাটার মর্ম গ্রহণ করতে পারল না। খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভিজে ভিজে গলায় বলতে আরম্ভ করল, আজ্ঞে বেচারা বড় অনাথা। এই ছ'মাস হল বিধবা হয়েছে, তিন সংসারে আর কেউ নেই। লোকের বাড়ি খেটেখুটে কোনোমতে দুটি ভাতের যোগাড় করে। সোয়ামি একটা শত্তুর দিয়ে গিয়েছিল পেটে, তারই ভরসা করে আছে। তা পরশু থেকে ব্যথা উঠেছে, কিন্তু এখনো তো' কিছুই হচ্ছে না। গাঁয়ের দাই বলছে, তাকে দিয়ে কাজ হবে না। যন্ত্রণায় মেয়েটা নীল হয়ে গেছে বাবু, আর বেশীক্ষণ এভাবে থাকলে টিকবে না। দয়া করে এখুনি একবার চলুন।

সশব্দে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললাম, জ্বালাতন! কোথায় যেতে হবে?

—মুকুন্দপুর।

হাট মুকুন্দপুর! সর্বাঙ্গ আমার জ্বালা করে উঠল: এখন ওই নদীর খেয়া পার হয়ে—এক ক্রোশ রাস্তা ঠেঙিয়ে?

লোকটা কাতরভাবে হাত জোড় করে বললে, দয়া করুন।

দয়া করব। খালি দয়া করাই বুঝি আমার কাজ? হঠাৎ আমার জামার পকেটে সেই একশো টাকার কয়েকটা ভগ্নাবশেষ খচমচ করে উঠল: আর বুঝি আমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? একটা পয়সা ঠেকাবার বেলায় কেউ নেই—

—আজ্ঞে ? বিহ্বলভাবে জানতে চাইল লোকটা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা তীব্র আঘাত লাগল মনের মধ্যে, সাম্‌থিং লাইক এ শার্প হুইপ্‌। চকিতে যেন সচেতন হয়ে উঠলাম। না, ওরা তো দয়া প্রার্থনা করে আমায় ডেকে আনেনি, আমি নিজেই উপযাচক হয়ে ওদের দয়া করতে এসেছিলাম। টু সার্ভ অ্যাণ্ড্‌ সেভ্‌ দি কান্ট্রি।

উঠে পড়ে বললাম ঃ চল্‌।

অন্ধকারে রূপনারায়ণের খেয়া পার হয়ে, মাইল দেড়েক ফসল কাটা মাঠের ধানের গোড়াগুলোতে হোঁচট খেতে খেতে যখন যথাস্থানে পৌঁছুলাম, তখন রাত প্রায় নটা। একটা প্রায় মুখথুবড়ে-পড়া ভাঙা খোড়ো ঘরে, লাল কেরোসিনের কালি-পড়া লণ্ঠনের বিবর্ণ আলোয় দেখলাম পেশেণ্টকে।

বছর কুড়িকের একটি চাষার মেয়ে। দারিদ্র্য-জীর্ণ শ্রীহীন মুখের ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। ইমিডিয়েট্‌ ডেলিভারী না হলে বেশীক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যাবে না—দি ডাই ইজ্‌ কাস্‌ট্‌।

প্রিলিমিনারী পরীক্ষার পরে দেখলাম, পেল্‌ভিক্‌ ওপেনিং অত্যন্ত ছোট। দুটিমাত্র উপায় আছে হাতে। এক সিজারিয়ান্‌ সেক্‌শন, দুই ফরসেপ্‌।

কিন্তু কলকাতাতেই তখন সিজারিয়ান্‌ অপারেশন্‌ ভালো করে রপ্ত হয়নি, তা এতো মেদিনীপুরের নামগোত্রহীন একটা অন্ধকার গ্রাম। কোথায় ওষধপত্র। সে প্রশ্নই ওঠে না। আর ফরসেপ্‌? তাও আমার ছিল না। ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের চিকিৎসাই করে এসেছি এতকাল, মিডওয়াইফারীর্‌ কোনো ব্যবস্থাপত্র তো করে রাখিনি।

চোখের সামনে মেয়েটা মরে যাবে ? তা হয় না। ডাক্তারের ইটার্নাল্‌ সেন্স্‌ অব্‌ রাইভ্যাল্‌রি জেগে উঠল মনের মধ্যে ঃ ফাইট্‌ টু ডেথ অ্যাট্‌ এনি কস্‌ট্‌।

মাইল চারেক দূরে একটা চ্যারিটেব্‌ল্‌ ডিস্‌পেন্সারীর প্রহসন আছে বটে। লোক পাঠালে একটা ফরসেপ্‌ মিলতেও পারে। সেই লোকটা

—নাম রঘুনাথ—তাকেই একটা স্লিপ্‌ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ফরসেপের সন্ধানে।

অন্ধকার বারান্দায় বসে আছি চুপ করে। আগষ্ট মাস। আকাশে চাঁদ নেই—থেকে থেকে শুধু দেখছিলাম এক একটা উল্‌কা অগ্নি-শরের মতো ছুটে যাচ্ছে রূপনারায়ণের তমসাচ্ছন্ন জলধারার দিকে। মাঠময় হাতছানি দিয়ে বেড়াচ্ছে আলেয়া। চারদিকের কালো রাত একটা প্রকাণ্ড পাইথনের মতো যেন সমস্ত গ্রামটাকে জড়িয়ে ধরে আছে, আর সেই সাপের গ্রাসে অসহায় একটা শিকারের মতো থেকে থেকে চাপা গোঙানি শোনা যাচ্ছে মেয়েটার। স্বামী হারিয়েছে, সব হারিয়েছে, অ্যাণ্ড্‌ নাউ—নাউ—শি ইজ্‌ এক্সপেক্‌টিং হার্‌ ফার্স্ট বেবী।

টু সার্ভ অ্যাণ্ড্‌ সেভ্‌ দি কান্ট্রি! কোনো অর্থ হয় না, কোনো যুক্তি নেই। এ শ্লো পয়জনের পৃথিবী—এখানে প্রত্যেকে এমনি করে মরবে, এমনি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে বাঁশবনের কান্না জাগানো রাত্রির হাওয়ায়; রক্তশোষী কোনো ড্রাকুলার মতো মৃত্যু তার প্রেত-ডানা মেলে দিয়েছে এখানে। সহ্য হয় না—সহ্য হয় না। ঘরের ভেতরকার ওই চাপা কান্নাগুলো থেমে গেলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—রক্ষা পাওয়া যায় আদর্শবাদের সুড়্‌সুড়ির উৎপাত থেকে।

রাত বারোটায় ফিরল রঘুনাথ। চ্যারিটেব্‌ল্‌ ডিস্‌পেন্সারীর ডাক্তারবাবু প্রথমে উঠতে চাননি ঘুম থেকে; তার পরে কিছু বাঁকা বাঁকা মন্তব্য করেছেন তাঁকে 'কল্‌' না দেবার জন্যে; শেষ পর্যন্ত চক্ষু-লজ্জার খাতিরে মরচে-পড়া একটা ফরসেপ্‌ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সব আয়োজন করে নিয়ে বসেছি, এমন সময় রামদাসবাবুর লোক এসে হাজির।

—এক্ষুণি যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

—কেন?

—ব্যথা উঠেছে। বাবু বড্ড ছট্‌ফট্‌ করছেন। বলছেন, যেমন করে হোক, যেখান থেকে হোক, আপনাকে এক্ষুণি ধরে আনা চাই।

—প্রথমবার, একটু দেরী হবেই। তুই চলে যা। কোনো ভাবনা নেই। বাবুকে বল্‌গে, হাতের কাজটা সেরেই আমি আসছি।

—না বাবু, তা হবে না। আমার চাকরী থাকবে না তা হলে। ছোটলোকের ব্যাপার বাবু, চট্‌পট্‌ সেরে নিন। আমি বসছি।

ছোটলোকের ব্যাপার! হঠাৎ মাথার ভেতরটা আগুন হয়ে উঠল আমার। বললাম, ছোটলোকের প্রাণটা বুঝি প্রাণ নয়? বল্‌গে, তোর বাবু টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনে রাখেনি, সময় পেলে যাব, নইলে যাব না।

থতমত খেয়ে লোকটা বিদায় নিলে।

বাট্‌ হাউ স্ট্রেঞ্জ্‌! একটা রোগা লিকলিকে মেয়ে, শরীরে খানকতক হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। অ্যাণ্ড্‌—অ্যাণ্ড্‌—সি ইজ্‌ ক্যারিয়িং এ ভেরি হেলদি বেবী! যতদূর মনে হল, প্রায় ন পাউণ্ডের মতো হবে।

আনাড়ী হাত, ফরসেপের ব্যবহার ভালো করে জানা নেই, খানিকটা টানাটানি করবার পরে দেখলাম, আমার পক্ষে এ সম্ভব নয়।

এ ভেরি হেল্‌দি বেবী। সূর্যের আলোকে প্রাণ আহরণ করে যদি বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে হয়তো দেখা দেবে একটা সম্পূর্ণ মানুষ। পাঁচ হাতের মতো লম্বা, লোহার কবাটের মতো চওড়া বুক—শালপ্রাংশু বাহু, এ বর্‌ন্‌ লীডার। আজকে হয়তো তোমাদের ভিলেজ-আন্দোলনের একজন নেতাই হয়ে দাঁড়াতো। আজ মনে হয়, হয়তো ভালোই করেছি—অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিয়েছি একটা বিষাক্ত সম্ভাবনাকে।

—ছেলেটা বেঁচে আছে তো?

—বিধবার একমাত্র ভরসা—

জনতার মধ্য থেকে আসছে, কৌতূহলী প্রশ্ন, উদ্বিগ্ন মন্তব্য। কী জবাব দেব? যদি জীবন্ত অবস্থায় এই শিশুকে পৃথিবীর বাতাসে নিয়ে আসতে না পারি, যদি—যদি নিজের হাতে আমাকে এর মাথাটা বিদীর্ণ করে দিয়ে হত্যা করতে হয়, তা হলে প্রাণ নিয়ে আমি কি

ফিরতে পারব ? কে বলতে পারে রূপনারায়ণের কোনো নির্জন চড়ার বালির নিচে এরা তা হলে আমাকে—

যদি ট্রেন্ড হাত্‌ হ্‌ত, যদি অভিজ্ঞতা থাকত, তাহলে আই অ্যাম্ অ্যাজ্ শিয়োর অ্যাজ্ এনিথিং—ছেলেটাকে আমি বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু কী হবে সে কথা ভেবে ? দে ডাই ইন্ থাউজ্যাণ্ড্স—একটা শিশুর মৃত্যুতে কতটুকু ক্ষতি হবে আর ? মনে পড়ল, ছেলেবেলায় একটা ভাঙা আলমারীর ভেতর থেকে বেরিয়েছিল লাল রঙের তিন চারটে নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা, জুতোর তলায় পিষে পিষে মেরেছিলাম তাদের—আজও সেই বীভৎস আনন্দের স্মৃতিটাকে ভুলতে পারিনি ! আজো পায়ে একটা কেঁচো ওঠার মতো সেই সেন্‌সেশানটাকে আমি মনে করতে পারি।

—না, মরে গেছে।

মিথ্যে উচ্চারণ করতে ঠোঁটে একবিন্দু দ্বিধা এল না আমার। কঠিন হাতে তুলে নিলাম ল্যান্‌সেট, নরম রুটির মধ্যে ছুরি বসানোর মতো মুহূর্তে ব্রেন পাংচার সমাধান হয়ে গেল। আগুনের মতো খানিকটা রক্তাভ-পীত ব্রেন্ ম্যাটার গলে গলে পড়তে লাগল আমার আঙুলে। আই হ্যাভ্ ক্রাশড্ এ ডেঞ্জারাস সীড্। পাঁচ হাত লম্বা হতে পারত —লোহার মতো প্রশস্ত বিশাল হতে পারত যার বুক –বজ্রকণ্ঠের হুঙ্কার দিয়ে হয়তো হাজার মানুষকে যে জমায়েত করতে পারত একসঙ্গে।

—মরে গেছে।

এক সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে সীমাহীন স্তব্ধতায় তলিয়ে গেল লোকগুলো। বিধবার একমাত্র ভরসা। কিন্তু হোয়াট্‌স হ্যাট্ টু দি ওয়াইড্ ওয়ার্ল্ড্ !

মাথাটা গলিয়ে দিয়ে যখন টেনে বের করে আনলাম, তখনো স্পষ্ট টের পেলাম বুকের মধ্যে ধুকধুকানির অস্পষ্ট আওয়াজ উঠছে, সাড়া দিচ্ছে জীবনের অন্তিম আকূতি। বাট্ নো মোর্। কৌশলে টিপে ধরলাম গলাটা—একতাল কাদার মতো তা নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল।

হাঁ—হয়তো বাঁচাতে পারতাম। আর একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে হয়তো জীবন্ত শিশুটিকেই বের করে আনা যেত। কিন্তু সময় কোথায়? ধৈর্য কই? বিনা পারিশ্রমিকে এর বেশি পরিশ্রম করা কি সম্ভব?

রামদাসবাবুর লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু এতক্ষণে মনের ভেতর অনুতাপ চাড়া দিয়ে উঠছিল। আরো একশো টাকা। তা ছাড়া ভাগ্যবানের ছেলে, রাজছত্র মাথায় নিয়েই তো সে জন্মাবে। অন্যায় হয়ে গেছে, অপরাধ করে বসেছি! এখুনি—এখুনি আমাকে ছুটতে হবে রামদাসবাবুর ওখানে। এক মুহূর্তও আর দেরী করা চলবেনা।

হাত ধুয়ে ফেলে তখনি সাইকেলে উঠে বসলাম।

রামদাসবাবু পুত্রলাভ করলেন শেষরাত্রে। সেফ, সাউণ্ড্ ডেলিভারি। আন্দাজ পাঁচ পাউণ্ড চামচিকের মতো রুগ্ন ছেলে। বাইরের ঘরে বসে কয়েক কাপ চা আর প্রচুর খাবারের শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিল না আমার।

অ্যাণ্ড্ ছ্যাট্ থিন্ বেবী—আজকের এই পোলিটিক্যাল্ লীডার্। তোমরা বলবে আর্মচেয়ার পলিটিশিয়ান—বলবে ক্যারিয়ারিস্ট। হোয়াট এভার ইউ লাইক্। রাজনীতির ব্যাপার আমি বুঝি না।

কিন্তু, হি ইজ্ এ বিগ্ লীডার, অল্ ইণ্ডিয়া ফেম্। লক্ষ নরমুণ্ডের সিংহাসনে নেতার অধিষ্ঠান। আর অভিষেকের সে রক্ততিলক আমিই প্রথম পরিয়েছি তার কপালে। শুড্ আই নট্ ফিল প্রাউড্?

ডাক্তার বটব্যাল এম্-ডি, এফ-আর সি-এস্ থামলেন। অপূর্ব শান্ত ভঙ্গিতে হেসে অগ্নিসংযোগ করলেন নিবে-আসা পাইপটায়।

উর্বশী

—তুমি কোথায় যাবে খোকা?—মুখ থেকে আধহাত ঘোমটা সরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

খোকা অর্থাৎ টুটুল তখন নিবিষ্ট হয়ে ছিল একরাশ টফির ভেতরে। সোনালী মোড়কটা খুলতে খুলতে, তাকিয়ে দেখল মেয়েটির দিকে। মেয়েটি হাসছে। হাসিটা ভালোই লাগল টুটুলের।

—আমরা আগ্রা যাব।—সাধ্যমতো গম্ভীর গলায় খোকা জবাব দিলে।

—আমাকে চিনতে পারো?—কেমন ফিস্‌ফিস্ করে বললে মেয়েটি। একবার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল ওয়েটিংরুমে আর কোথাও কেউ নেই। শুধু বাইরে দরজার পাশে একটা ডেক চেয়ারে ঘুমুচ্ছেন একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন—অতএব ওটা সহজে ভাঙবার সম্ভাবনা নেই।

টুটুল এবার বিরক্ত হল। মোড়কটা খুলতে গিয়ে খানিক ছিঁড়ে লেগে রইল টফির গায়ে। সোনালী চমৎকার মোড়কটাকে অবিকৃত-ভাবে উদ্ধার করার ইচ্ছে ছিল তার।

টুটুল সংক্ষেপে বললে, না।

মেয়েটি নাছোড়বান্দা। বললে, তাকাও না একবার—ভালো করে ছাখো আমার দিকে। আমি তোমায় অনেক চকোলেট্, লজেন্স্ কিনে দেব। বলো তো, কোনোদিন কোথাও আমাকে দেখেছ কিনা?

এ কী-রকম অন্যায় আর অদ্ভুত প্রশ্ন! চকোলেট্ আর লজেন্স্-এর লোভেও টুটুল খুশী হতে পারল না। সাত বছরের টুটুল বয়সের

তুলনায় একটু বেশি গম্ভীর। আবদার করার অভ্যেস নেই, চেঁচিয়ে কাঁদতে জানে না, রাগ হলে বাড়ির সামনের মুচুকুন্দ ফুলের গাছটার তলায় গুম হয়ে বসে থাকে শুধু। বাড়ির লোকে ঠাট্টা করে বলে, ঋষি শুকদেব।

সমস্ত জিনিসটা খুব বিরক্তিকর মনে হল টুটুলের। ঘোমটা দিয়ে বসে ছিল—বেশ তো ছিল। হঠাৎ তার ওপরে এমন উপদ্রব কেন? অগত্যা তাকিয়ে দেখতে হল তাকে। না—নেহাত মন্দ নয় চেহারা। তবে ঠোঁট দুটো বড্ড বেশি টকটকে লাল—যেন টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো দেখতে। অতবড় মেয়ের চোখেই বা কাজল কেন? আর সব চাইতে আশ্চর্য—মেয়েটার হাতের নখগুলোতে আলতামাখানো।

টুটুল আবার বললে, না—আপনাকে আমি কোনোদিন দেখিনি।

মেয়েটি যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ধরে চুপ করে দেখতে লাগল টুটুলের টফি খাওয়া। তারপর জিজ্ঞাসা করলে তোমার বায়োস্কোপ দেখতে ভালো লাগে?

—ধেৎ!—টফি চিবুতে চিবুতে টুটুল বললে, ছোট ছেলেদের কি বায়োস্কোপ দেখতে আছে?

—নেই বুঝি?—এইবারে মেয়েটির মুখ প্রশ্রয়ের হাসিতে ভরে উঠল।

—না।

—তবে কারা দেখে বায়োস্কোপ?

—বাবা, মা, কাকু। আর দুষ্টু ছেলেরা যায়—কিন্তু তাদের লেখাপড়া হয় না। বায়োস্কোপ দেখে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে যায়। তখন তারা হাজীগঞ্জের বাজারে পান বিড়ির দোকান দেয় নইলে রামচরিতের মতো পয়েন্টস্‌ম্যান হয়। কিন্তু তারা কেউ স্টেশনের বড়বাবু হতে পারে না—কক্ষনো না।—প্রাজ্ঞের ভঙ্গিতে টুটুল তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ করলে। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়বার উপক্রম করছিল মেয়েটি, অনেক কষ্টে সামলে নিলে নিজেকে।

—তোমার বাবা বুঝি বড়বাবু? স্টেশন মাষ্টার?

টুটুল আশ্চর্য হল।—কী করে জানলেন?

—আর রামচরিত তোমাদের পয়েন্টস্‌ম্যান—না ?

—আপনি রামচরিতকেও চেনেন ?—টুটুলের গভীর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসল : আমি আরও অনেক খবর জানি। তোমাদের বাড়িতে খোকন কার নাম ?

—আপনি খোকনকেও দেখেছেন ?—টুটুল এবার টফির কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল : আমি টুটুল, তারপরে লোটন—সব চেয়ে ছোট হল খোকন। তার বয়েস মোটে ছ'মাস—এখনো হামাই দিতে পারে না ভালো করে। আপনি কোথায় দেখলেন খোকনকে ?

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না—স্নিগ্ধ কৌতুকভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল টুটুলের দিকে। বাইরে একটা মাল গাড়ির শান্টিংয়ের আওয়াজ শোনা গেল, তার মধ্যেও টের পাওয়া গেল ঘুমন্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের নাক ডাকছে।

টুটুল বললে, আপনি তো সব জানেন দেখছি। আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন বুঝি কোনোদিন ?

মেয়েটি তবুও চুপ করে রইল। চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের আভাটা মিলিয়ে এল ধীরে ধীরে।

—তোমার বড়দি কোথায় থাকে টুটুল ?

—বড়দি ?—টুটুল চিন্তিত হল,—বড়দি তো কেউ নেই। ছোট-বাবুর বাড়িতে ইলাদি থাকে। রাত-দিন ওর মার সঙ্গে ঝগড়া করে। কিন্তু বড়দি তো কোথাও নেই।

—তোমার নিজের কোনো দিদি নেই বুঝি ?

—না তো। আমিই সব চেয়ে বড়।

—তুমি জানো না—মেয়েটি হাসল। কিন্তু এবারের এই হাসিটা কেমন যেন অদ্ভুত রকমের মনে হল টুটুলের। মেয়েটি বললে, হয়তো তোমার এক বড়দিদি ছিল।

—তাই নাকি ?—টুটুল সমস্যায় পড়ল,—আমি তো কোনোদিন তাকে দেখিনি।

—তুমি কী করে দেখবে ? তখনো তুমি হওনি। একদিন তোমার বাবার সঙ্গে সে মেলায় গিয়েছিল কাচের চুড়ি, চিনির মঠ আর মাটির পাখি কিনতে।

টুটুল বললে, আমি জানি। হাজীগঞ্জের মেলায়।

—ঠিক ধরেছ, হাজীগঞ্জের মেলায়। সেখানে মস্ত বড় একটা নাগরদোলা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল।

—আমি চড়েছি নাগরদোলায়।—টুটুল হঠাৎ খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল : বেশ লাগে চড়তে। নেমে এলে মনে হয়, মাটিটা সুদ্ধু দুলছে।

—তাই বটে। মেয়েটি আরো কাছে এগিয়ে এল টুটুলের। ফিস ফিস করে বললে, তোমার বড়দিও টুক করে এসে নাগরদোলায় উঠে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে দুলল মনের খুশীতে। তারপর যখন নেমে এল মাটিতে, তখন তোমার বাবাকে আর কোথাও খুঁজে পেল না।

—হারিয়ে গেল বুঝি ?—টুটুল চমকে উঠল।

—গেল বই কি।

—তারপর আবার কী করে ফিরে গেল বাড়িতে ?

—আর তো ফেরেনি। কোনোদিন ফিরে আসেনি আর।

—ফিরে আসেনি ?—টুটুলের প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আতঙ্কে : কোথায় গেল তা হলে ? ছেলেধরায় নিয়ে গেল বুঝি ?

—ছেলেধরা ? তাই বটে।—মেয়েটির চোখ চকচক করে উঠল।

সীমাহীন ভয়ে টুটুলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল : কী সর্বনাশ! তারপর কী করল ছেলেধরা ? কোথায় নিয়ে গেল দিদিকে ?

—তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে ? কত জঙ্গল, কত বাঘ-ভালুক, কত অন্ধকার। চারদিকে শুধু হালুম হালুম চিৎকার—সবাই, সবাই তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়।

—খেয়ে ফেলল ?—টুটুলের বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

—এক রকম খেয়ে ফেলাই বইকি।—আবার কিছুক্ষণ মগ্নদৃষ্টিতে চেয়ে রইল মেয়েটি : গায়ে অনেক নখের আঁচড় লাগল তার, অনেক

দাঁতের দাগ। তারপর আস্তে আস্তে বন-জঙ্গল তার অভ্যেস হয়ে গেল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বাঘ-ভালুকেরা ভয় পেতে লাগল—একে একে এসে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের তলায়। এখন লোকে তাকে বলে জঙ্গলের রাণী।

—সত্যি?

—সত্যি।

টুটুল বিহ্বল হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ধেৎ! সব বানিয়ে বলছেন আপনি।

—তুমি এখনো ছেলেমানুষ কিনা, তাই বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা মনে করো—যদি বলি, আমিই তোমার সেই দিদি, তা হলে?

—আপনি। কী সব যা তা বলছেন। এক্ষুনি বললেন, আমার দিদি জঙ্গলে আছে, সে জঙ্গলের রাণী, আর এখন বলছেন আপনিই আমার দিদি?

—হতে দোষ কী? চেষ্টা করলে কি বেরিয়ে আসা যায় না জঙ্গল থেকে?—মেয়েটির গলার আওয়াজ কেমন ভারী হয়ে উঠল: আচ্ছা টুটুল, তোমাদের হাজীগঞ্জে শিউলিফুলের গাছ নেই?

—কী কথা থেকে কিসে। স্থির, শান্ত শুকদেব টুটুল, এতক্ষণে ছটফট করে উঠল: থাকবে না কেন—অনেক আছে?

—আমি যদি তোমার দিদি হয়ে চলে যাই, তা হলে রোজ সকালে তোমাকে শিউলিফুলের মালা গেঁথে দেব আমি। তোমাদের গ্রামের কাছে নদী নেই? আছে? অজয় তার নাম? বেশ, সেই অজয়ের জলে তোমাকে আমি সাঁতার কাটতে শেখাব। ফাগুন মাসে অজয়ের ধারে যখন বৈঁচি পাকবে, তখন দুজনে মিলে পাকা পাকা মিষ্টি বৈঁচি খেয়ে বেড়াব। তুমি আর আমি দুটো ছোট ছিপ তৈরি করব, তারপর কোনো পুকুরের ধারে বসে পুঁটি মাছ ধরব। এক একদিন দুজনে মিলে যাব চড়ুইভাতি করতে—আমি খিচুড়ি রান্না করব, তুমি খাবে। আর শেষে একদিন যখন আমার বিয়ে হবে, অনেক আলো জ্বলবে আর অনেক শঙ্খ বাজবে, তখন লাল চেলি পরে কাঁদতে কাঁদতে আমি

আর একজনের সঙ্গে পালকিতে গিয়ে উঠব—আর যাওয়ার আগে তোমাকে এমনিভাবে জড়িয়ে ধরে চুমু খাব।

পুতুলের মতো দুটো অতল কালো চোখে যেন রামধনু দুলছে টুটুলের। এতো আর গল্প নয়। এ সবই হতে পারে—যদি তার দিদি থাকে, তা হলে এক্ষুনি হতে পারে এ সমস্ত। ইলাদি'র চাইতে অনেক—অনেক সুন্দর হতে পারে তার দিদি। আর—

কিন্তু মাঝপথে ভাবনা থমকে গেছে টুটুলের। সত্যিই তো তাকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটি। আর—আর কি আশ্চর্য, চোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল পড়ছে টুটুলের গালের ওপরে।

—রূপা, ট্রেন আসছে।—একটা বিশ্রী মোটা গলার ডাকে হঠাৎ গমগম করে উঠল টুণ্ডলা স্টেশনের ওয়েটিংরুম। অজয়ের ধারের বৈঁচি-বন থেকে বহু দূরে চমকে সরে এল পৃথিবীটা। বাইরে ট্রেনের ঘণ্টা বাজছে—ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছেন সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। ভেতর দিকে তাকিয়ে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, আবার তুমি ঘোমটা খুলেছ রূপা? তুমি কি চাও, তোমার 'ফ্যানের' দল এখানে এসেও চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াক? তারপর একটা 'সীন' তৈরী হোক স্টেশনে?

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর আধ হাত ঘোমটা টেনে দিলে মেয়েটি। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, কুলি—কুলি—

তিন চারটে কুলি হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ওয়েটিংরুমে। ছোট বড় একরাশ জিনিসপত্র নিয়ে হৈ-চৈ শব্দে টানাটানি শুরু করে দিলে। প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মতো দিল্লী মেল এসে থেমেছে।

এক মিনিট—দু'মিনিট—তিন মিনিট। টুটুল বসে রইল ছবির মতো। ওয়েটিংরুমে সেই মেয়েটি নেই—কোথাও কেউ নেই। সে একা। বাইরে আবার রেলের ঘণ্টা পড়ল, বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল—দিল্লী মেল বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

এর আগেই এসেছিলেন টুটুলের বাবা রাধেশবাবু। কিন্তু ঢুকতে সাহস পাননি। বাইরে চোখ কচলে কচলে ভাবছিলেন তিনি স্বপ্ন

দেখছেন কিনা। এবারে উত্তেজিতভাবে তিনি টুটুলের পাশে এসে বসলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, এই জন্যেই ঘোমটা দিয়ে বসেছিল। ইস্, আগে যদি চিনতে পারতাম। ও কে, জানিস টুটুল? নামকরা স্টার স্বরূপা দেবী—বাংলা-বোম্বাই ওঁর নামে অজ্ঞান। ওঁর 'মধু চাঁদ' আর 'ঝুম ঝুমাঝুম' দেখে তিন রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। ইস্—কী ভুলই হয়ে গেল! যদি সাহস করে এগিয়ে এসে আলাপ করে নিতে পারতাম—বলতে বলতে হঠাৎ রাধেশবাবুর আবেগটা মরে গেল। তাঁর মনে পড়ল, নিজের সাত বছরের ছেলে টুটুলের সঙ্গে কথা কইছেন তিনি।

সামলে নিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে, আর প্রায় ধরা গলায় রাধেশবাবু বললেন, তোকে কোলে নিয়ে খুব আদর করছিলেন—নারে? ঠিক তোর মার মতো, নারে? যেন তোর মা তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তাই না?

—মা হবে কেন? ওযে আমার দিদি। যে দিদি হাজীগঞ্জের মেলায়—প্রতিবাদ করে বলতে যাচ্ছিল টুটুল, হঠাৎ অকারণ ক্রোধে ফেটে পড়লেন রাধেশবাবু। মুহূর্তের মধ্যে যেন বিশ্রী আর বিকৃত হয়ে গেছে তাঁর মুখ। টুটুলের কথাটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভেংচে বললেন, দিদি! তোর দিদি আবার জন্মালো কবে? আর অমন নচ্ছার মেয়েমানুষ তোর দিদি হতে যাবে কোন্ দুঃখে! ওদের মুখ দেখলেও গঙ্গাস্নান করতে হয়। নে, ওঠ—আগ্রার গাড়ি দিয়েছে প্ল্যাটফর্মে।